12. Pri. 925. 12.

বাংলার বল্‌শী

আবুল হুসেন এম্-এ, বি-এল,

অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৩২

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য আট আনা।

প্রবন্ধ-সূচি

প্রবন্ধ				পৃষ্ঠা
১।	বাংলার বল্‌শী	...	...	১
২।	কৃষকের আর্ত্তনাদ	...	...	১০
(ক)	চাষা ও জমি	...	...	১৫
(খ)	জমি ও গরু	...	...	২০
(গ)	জমি ও সার	...	...	২৫
(ঘ)	চাষার ঋণ ও কোঅপারেটিভ ক্রেডিট্‌	...	...	৩১
৩।	কৃষকের দুর্দ্দশা	...	...	৩৪
(ঙ)	কল ও চরকা	...	...	৫৪
৪।	কৃষি-বিপ্লবের সূচনা	...	...	৬১

12. Pri. 925. 12.

বাংলার বল্‌শী

আবুল হুসেন এম্-এ, বি-এল,

অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৩২

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—
মুহম্মদ ফয্‌লুল
"তরুণপত্র"
৯৩, ফুলবাড়িয়া

প্রকাশক—
মুহম্মদ ফয্‌লুল করীম মল্লিক
"তরুণপত্র" কার্য্যালয়
৯৩, ফুলবাড়িয়া রোড, ঢাকা।

আবদোররাজ্জাক দ্বারা মুদ্রিত
ইস্‌লামিয়া প্রেস, নাজিমউদ্দা, ঢাকা।

প্রবন্ধ-সূচি

প্রবন্ধ				পৃষ্ঠা
১।	বাংলার বল্‌শী	...	...	১
২।	কৃষকের আর্ত্তনাদ	...	...	১০
(ক)	চাষা ও জমি	...	...	১৫
(খ)	জমি ও গরু	...	...	২০
(গ)	জমি ও সার	...	...	২৫
(ঘ)	চাষার ঋণ ও কোঅপারেটিভ ক্রেডিট্‌	...	...	৩১
৩।	কৃষকের দুর্দ্দশা	...	...	৩৪
(ঙ)	কল ও চরকা	...	...	৫৪
৪।	কৃষি-বিপ্লবের সূচনা	...	...	৬১

গ্রন্থাভাষ

এ কথা যথার্থ যে বাংলার উন্নতি সম্পর্কে নানা আলোচনা সমালোচনা, আলাপ আন্দোলন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্ব্বত্রই এক অভূতপূর্ব্ব জাতীয় চেতনার সূচনা করিতেছে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলনেই বিশেষ ব্যগ্রতা নেতৃবর্গ ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। দুর্ভিক্ষের পীড়া নিবারণে, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের প্রতিকার-কল্পে, শিশু মঙ্গলের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, মাদকতা দূরীকরণের চেষ্টায়, নারী নিগ্রহের বিলোপ সাধনে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিরাট ব্যাপারে অনেকে লিপ্ত, চিন্তিত, কর্ম্মে তৎপর। কিন্তু দেশের যাহারা প্রাণ, যাহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও দুরবস্থার প্রতিকার অভাবেই দেশে নানা প্রকারের বিপদ সঙ্গীণ হইয়া উঠিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতেছেনা।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাশীলকৃতী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় মৌলহুবী আবুলহুসেন সাহেব তাঁহার ছাত্রাবস্থায় লিখিত ও "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য প্রত্রিকায়" প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধ আমাকে পাঠের জন্য প্রদান করেন। আমি প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি এবং এ গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। মৌলহুবী সাহেবের বিবেচনায় ছাত্রাবস্থায় লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকারে প্রকাশের অযোগ্য হইলেও আমি তাহা প্রায় একপ্রকার কাড়িয়া লইয়া **"বাংলার বল্‌শী"** নাম দিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

আমার বিবেচনায় লেখকের ভাষা ও লিপিকৌশলের (Style) পরিবর্ত্তন অপ্রয়োজন বরং যথাযথ ভাবেই রাখা সঙ্গত। এ জন্য, লেখকের ভাষার ও প্রকাশ ধারায় বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তন ঘটিলেও আমি পূর্ব্ববৎ রাখিয়া দিলাম। আমার গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস যাহারা **"বাংলার বল্‌শী"** পাঠ করিবেন তাঁহারাই আমার মত আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন

বিশেষতঃ যাঁহারা দেশ ও জাতির সেবা সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও করিতে বাসনা রাখেন অথবা দেশের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিতে আগ্রহ করেন তাঁহারা ইহা পাঠে নিশ্চয়ই "পথ" খুঁজিয়া পাইবেন—যে পথে দেশহিত সাধনার তপস্যা সার্থক হয়।

পল্লীসংস্কার, পল্লীগঠন, গ্রামহিতসাধন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকে চিন্তা করেন, এবং অনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও অনেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট। আমি তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে 'বাংলার বল্‌শী' পাঠে অনুরোধ করিতেছি।

কৃষক ও কৃষির যাবতীয় সমস্যা, সমবায় মণ্ডলীর ও যৌথঋণদান সমিতির বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে বিবৃত করা হইয়াছে। আশা করি ইহাতে চিন্তাশীলের চিন্তা পুষ্ট ও নিশ্চিন্তের চিন্তার অভ্যাস নিয়মিত ও উন্নত প্রণালীতে শৃঙ্খলিত এবং ব্যাপক হইবে।

ন্যায় ধর্ম্মের মধ্যে গলদ নাই এবং ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইলে সকলেই সক্ষম হইতে পারেন এবং ন্যায় ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও শক্তি সম্পন্ন হয় এই সত্যকে লেখক অন্তরের সহিত যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং দেশের উন্নতি কল্পে যে ভাবে চিন্তা করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধ গুলির প্রতিছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। **"বাংলার বল্‌শী"** আসন্ন প্রায় কৃষি-বিপ্লবের সূচনার প্রারম্ভেই সাবধানতার অগ্রদূত রূপে প্রকাশিত হইল। 'বল্‌শী' শব্দটী বল্‌শেভিক শব্দের অবজ্ঞা সূচক অপভ্রংশ।

আমরা বিশেষ ভাবে বাংলার জমিদার-বর্গকে "বাংলার বল্‌শী" পাঠে সবিনয় নিবেদন করিতেছি। বিভিন্ন কর্ম্মের ও বিভিন্ন কর্ম্ম সাধনার স্বেচ্ছাসেবকগণও এই পুস্তক পাঠে পরম উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে নিবেদন, সহৃদয় পাঠক পাঠিকার আগ্রহ দেখিলে আমাদের শ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে। আশা করি লাইব্রেরী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ একখানি করিয়া **"বাংলার বল্‌শী"** লাইব্রেরীতে রাখিবেন।

মুহম্মদ ফয্‌লুল করীম মল্লিক

বাংলার বলশী

বৎসরের সকল ঋতুতেই বাড়ী যাই, কিন্তু মাঠের মধ্যে চাষাদের কাজকর্ম্ম দেখে আমার একটুও মনে হয় না যে, তারা উন্নতির দিকে যাচ্ছে। সেই একঘেয়ে জীবন তারা টেনে চলেছে, শুধু প্রাণী বলেই এবং বাঁচবার জন্য তাদের খোদা নিয়ম ক'রে দিয়েছেন ব'লেই। তা বলে তাদের বাঁচতে হচ্ছে কেন এবং কি ক'রে বাঁচতে হয় তা তারা জানে না। দুনিয়ার বুকে পা দিয়েই তারা বৈচিত্র্যবিহীন নিরানন্দ পল্লীর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ও খড় দিয়ে ছাওয়া কুঁড়ের মধ্যে যা দেখে তাই তাদের শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখতে হয়; তার চেয়ে এতটুকু বেশী দেখবার উপায় তাদের নেই। সেটা যেন তাদের অদৃষ্টেরই লেখা। সেই সরল অথচ অসুন্দর অবস্থার মধ্যে গুটিকতক অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাদের এ দুনিয়া থেকে 'তলপী তোল রে ভাই' গাওয়ার সময় পৌঁছে যায়। অভাবের মধ্যে তাদের আহার ও অতি সামান্য আচ্ছাদন, শুধু কেবল লজ্জা নিবারণ করবার জন্য। এই জন্য তারা দিনরাত খাটছে, প্রাণপাত করে দিচ্ছে – বৎসরের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত—শুধু খাঁটুনিতেই জীবন নিযুক্ত ক'রে রেখেছে। এ ছাড়া প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের অত্যাচারের হাতও তারা এড়িয়ে চলতে পারে না। ওদিকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে যেমন বাংলার চাষা অহর্নিশ চিন্তাকুল মনে দিনযাপন করছে, তেমনি ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ সহ্য করতে গিয়ে তাকে দুনিয়ার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে। পুত্রকন্যা-পরিবৃত হ'য়ে তার চিন্তারাশি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে একেবারে মাটির ওপর বসে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়ে গুলিও একটু 'সেয়ানা' হ'তে না হ'তে ঐ পিতামাতার একঘেয়ে জীবনের সকল যন্ত্রণা ও পরিতাপের অংশীদার হয়ে বস্‌ছে। তারা শিখ্‌তে পেলে না, কি ক'রে দুনিয়ার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়। তারা জান্‌ল না, দুনিয়ায় চল্‌তে হলে কি কি কৌশল, কি কি বিদ্যা শেখবার দরকার। সে নৌকা চালাতে না শিখেই মাঝ নদীর মহা তুফানে নৌকা ছেড়ে দিলে। পরিণামটা যে এর কি হচ্ছে তা দেশের অন্তর যারা দেখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁরাই বুঝতে পাচ্ছেন।

দুনিয়ার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিরন্তর যুদ্ধ চল্‌ছে—মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই ঘোর যুদ্ধ ক্রমশঃ বিপুল হয়ে উঠ্‌ছে; কিন্তু, এই যুদ্ধে টিকে থাক্‌বার মত শক্তি আমাদের চাষাদের কোথায়? আমার মনে হয়, তারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে; শক্তি সঞ্চয় ত দূরের কথা, তারা এই যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয় লাভ করছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সংগ্রামটা একরূপ অনিবার্য্য ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারা রোগে ভুগ্‌ছে—জন্মলাভ করতে না করতে মৃত্যুর কবলে পড়্‌ছে—উপযুক্ত আহার অভাবে অস্থিকঙ্কালসার হচ্ছে। অভাবের তাড়না নিবারণ করবার মত উৎপাদন তারা করতে পারছে না। মানুষের জীবনের কর্ত্তব্যগুলি কি, তা তারা জানতেই পাচ্ছে না, তার পর ত কর্ত্তব্য পালন—সে বহু দূরের কথা। মাতাপিতার কর্ত্তব্য, পুত্রকন্যাকে সংসারের নানাবিধ জ্বালাযন্ত্রণা কষ্ট-দুঃখ সহ্য করতে শক্তিমান্ করে তোলা। কিন্তু বাংলার চাষা মাতাপিতা তাকে অকালেই কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গী করে তোলে। ইহাতে তাদের অপরিপক্ক মন ও শিশু-শরীর অচিরে ভেঙ্গে পড়ে। কেহ বা ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়, কেহ বা চিররুগ্ন হ'য়ে যাবজ্জীবন প্রকৃতির কর দিতে দিতেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এই রুগ্ন চাষার অস্তিত্বকে আজ বাংলার পল্লীপ্রকৃতি নীরবে উপহাস ক'রে বেড়ে উঠ্‌ছে।

এই ভগ্নস্বাস্থ্য চাষাপল্লীর সকল সৌন্দর্য্যই প্রকৃতি নিজের সামগ্রী ক'রে তুলেছে, তা আর তাদের উপভোগ করবার মত নাই। সে কেবল কবিরাই দেখ্‌ছে।

বাংলার সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রকৃতিকে ভোগ করবার মত কেহ আর বাংলার পল্লীতে নাই। সেখানে যারা আছে তাদের অদৃষ্টে প্রকৃতির রমনীয়তা অলীক বলেই যেন লেখা হয়েছে। তারা প্রকৃতির কোলে ব'সে রয়েছে, অথচ তাদের উপভোগ করবার অবস্থা নাই। প্রকৃতি তাদের ওপর সাতাটী বৎসর ধরে অত্যাচার অনাচার করে চলেছে, ওরা তা নীরবেই সহ্য করে। পরাজিতের মত নীরবেই চলে যাচ্ছে; তা কেউ দেখ্‌তেও পাচ্ছে না। তাদের সেই অসহায় বেদনাপূর্ণ পরিণামের জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলবারও কেউ নাই।

কিন্তু কেন এ অবস্থা? প্রকৃতি আজ কেন চাষার উপর এত দৌরাত্ম্য ও অনাবশ্যক আধিপত্য জারি ক'রে তাকে সংসারক্ষেত্র হ'তে হটিয়ে দিচ্ছে? তার কারণ দু একটা বল্‌বার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রকৃতি যে কেবল একা দোষী তা নয়। প্রকৃতি ত তার অফুরন্ত শক্তির বিকাশকে কখনও ক্ষুণ্ণ করতে চায় না—কেবল মানুষই তার স্ফূর্ত্তিকে ধরে বেঁধে পিছনে হটিয়ে দিতে চায়। তাকে খর্ব্ব ক'রে নিজের প্রভুত্ব ও শক্তিমত্তাকে চরম ক'রে তুলতে চায়! মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সেই আদিমকাল থেকে যুদ্ধ করে আস্‌ছে। তার সঙ্গে কোনদিনও আপোষ হ'তে আজও কেউ দেখেনি। ইতিহাসের বুকে এটা খুব পুনরাবৃত্তি ক'রে লেখা আছে। আবার কত না যুদ্ধের কথা মানুষের স্মৃতিরাজ্য হ'তে বহুপূর্ব্বে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে! মোট কথা, এই যে যুদ্ধটি লেগেই আছে তাহা আর অস্বীকার করার জো নাই। প্রকৃতি যদি একা মানুষকে লোপ কর বার জন্য লেগে যেত তাহলে বাংলার অবস্থার জন্য দুঃখ করবার আবশ্যক

দেখতাম না। প্রকৃতি মানুষকে লোপ করবার ইচ্ছা করে না বরং অনেক ক্ষেত্রে সে মানুষকে বাঁচাবার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতিকে বন্ধন করতে প্রয়াস পায় তখনই উভয়ের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ উপস্থিত হয়ে পড়ে। মানুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা ক'রে থাকতে পারত তাহলে বোধ হয় এই অনাবশ্যক যুদ্ধের আবশ্যক হ'ত না—তাহলে মানুষের কোন দুঃখ হ'ত না। মানুষ যতই প্রকৃতিকে শত্রু মনে ক'রে তার বিরুদ্ধে যেতে চেষ্টা করছে—যতই তাকে জয় করবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে ততই সে নিজের কৌশলের দুর্ব্বলতা অনুভব করছে ও ততই তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ, অসুখী, অসন্তুষ্ট, উদ্বিগ্ন, ম্রিয়মান ও অযোগ্য দেখ্‌তে পাচ্ছে। প্রকৃতি আপন মনে তার নিজের স্বচ্ছন্দগতিতে সেই খোদার চরন পরম বিকাশ সার্থক ক'রে চলে যাচ্ছে। মানুষ নিজে কর্ম্মের ভুক্তভোগী হ'য়ে সমাজ ও সংসারকে আলোড়িত করে তুল্‌ছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এর দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। মানবের এই অশান্তির নিবৃত্তির জন্য কত কত থিওরির আবির্ভাব হ'য়ে যাচ্ছে তারই বা ইয়ত্তা করা যায় কত। কেহ বা প্রকৃতির সঙ্গে একটা রফা করতে চাচ্ছে, পুনরায় আদিম যুগের শান্ত সরল জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠ্‌ছে ও প্রকৃতির নীরব সুন্দর নিবিড় রসসম্পদের মধ্যে মনের চরম তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মিটাবার চেষ্টা পাচ্ছে। সকলেই এই প্রকৃতি ও মানবের মহাযুদ্ধকে এক-বাক্যে অপসন্দ কচ্ছে।

কিন্তু এ যুদ্ধ থামবার নয়। মানুষের জয়ের তৃষ্ণা প্রকৃতির সহজ বর্দ্ধনশীলতার সঙ্গে ক্রমাগত বেড়ে যাবে ;কবে যে তার নিরাকরণ হবে তা বিশ্বভুবনের সেই "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" জানেন। কেহবা এই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতেই মানুষের পরম পুরুষকার প্রকাশ পাবে খ'লে মানুষকে এক তিলার্দ্ধ ব'সে থাকতে দিতে চাচ্ছে না। ব'সে

থেকে চোক বুঁজে সেই পূর্ণের চিন্তা করবার ভান করাতে ভারতবর্ষের লোক পশ্চিমের নিকট অনেক বকুনি খাচ্ছে। পশ্চিম তাকে নিশ্চেষ্ট, অকর্ম্মণ্য, অলস বলে জ্ঞানবত্তার আসনে বসে কত না মুরব্বিয়ানা কচ্ছে। পশ্চিম আজ প্রকৃতিকে পরাজয় করতে যেয়ে যেন সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বসেছে এমনি ভাব। এখন কে সত্য কথা বলছে তা পাঠকের 'তবিয়ত'ই ঠিক ক'রে নেবে।

প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ ফেলে আমি নিষ্কৃতিলাভ করতে চাচ্ছি না। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের—এই বলতে গিয়ে কতকগুলি বোধ হয় অবান্তর কথা বলা হয়ে গেল—তা পাঠকের ধৈর্য্যের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

প্রকৃতি আপন গতিতে আপনার নিয়মের মধ্যে চলতে গিয়ে যদি মানুষের উপর অত্যাচার ক'রে বসে সে জন্য মানুষ তাকে দোষ দিতে না গিয়ে যদি নিজে সেটাকে শোধরাতে যায় তবে সকল গোল চুকে যায়। এখানে মানুষের যে শক্তি বিশ্বকর্ত্তা দিয়েছেন তারই আবশ্যক হয়ে পড়বে। মানুষ সে শক্তির অপচয় না করতে পারে কিন্তু যদি সেটাকে না ব্যবহার করে তবে সে নিশ্চয়ই দোষী। তবে সকল মানুষের শক্তি সমান নয় এবং শক্তি চালনার কর্ত্তব্য সকলের সমান নয়। এজন্য সমাজের মধ্যে যার শক্তি আছে সে তাহা ব্যবহার করে না বলেই, দুর্ব্বল কোন কাজই করতে পারে না এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, শক্তিমান্ নিজের শক্তিকে পরিচালনা না ক'রে দুর্ব্বলের উপর শুল্ক আদায় করতে একটুও দ্বিধা, লজ্জা বা লজ্জাহীনতার গ্লানি অনুভব করে না। শক্তি দুর্ব্বলতার উপর কর চাপিয়ে দিচ্ছে, ইহা সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে দেখতে পাওয়া যাবে এবং চিরদিন ইহা চলে আসছে।

বাংলার চাষা সমাজে এই মানব প্রকৃতির নীতির কঠোর প্রাবল্য কিছু কম নয়। দুর্ব্বল চাষার উপর নানা শক্তির চাপ পড়ে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে

ততই চাষার স্কন্ধে বিবিধ চাপের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি একদিকে তার ক্ষীণ শক্তিকে বেশী ক'রে টানছে, এদিকে মানুষ তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। সে দুর্ব্বল, তাই সে অজ্ঞ। সে অজ্ঞ তাই সমাজের স্তরে তার নাম সবার নিম্নে পড়ে রয়েছে। সে উপরে উঠ্‌তে পাচ্ছে না। তাকে চাষা ব'লে সবাই নীচে ফেলে রেখেছে কিন্তু চোখ রাঙিয়ে এরই কাছ থেকে আবার তাঁদের উচ্চ স্তরের মশলা আদায় কচ্ছে। তারা ভারবাহী জন্তুর মত তাদের হুকুম তামিল ক'রে যাচ্ছে ও চিনির বলদের মত উৎপাদন করে চলেছে কিন্তু ভোগ করতে পাচ্ছে না। ইউরোপে ধনী শক্তিশালী শ্রমীর ওপর চেপে বসেছে। শ্রমী উৎপাদন করে যাচ্ছে—ধনী তা উপভোগ কচ্ছে—কেহ বা শুধু অভোগ্য অর্থ কেহবা ভোগ্য দ্রব্য। বাংলার পল্লীতে চাষা আর ইউরোপের কলে শ্রমী একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে। এখানে চাষা সমাজকে মাথায় করে রেখেছে, সেখানে শ্রমী সমাজকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ধনী জমিদার এখানে চাষার উপর আধিপত্যের নিদারুণতা দিন দিন নিবিড় করে তুলছে, সেখানে ধনী কলের মালিক শ্রমীকে অষ্টেপৃষ্ঠে কলের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে। শ্রমী সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বাংলার চাষা জমির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। সেখানে কল তবু বৎসর বৎসর মেরামত হচ্ছে এখানে সেটুকুও হচ্ছে না। জমিদার চাষাকে খাটাচ্ছে কিন্তু কৈ তার যে জমি তা মেরামত করতে দেখছি না। জমি আর কত পারে? জমির ওপর পড়ে চাষা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাঁটছে—সারা বৎসরের খাটুনির ফল সংগ্রহ করে ঘরে তুল্‌তে না তুল্‌তে জমিদারের পেয়াদা বা সেপাহীর হাঁক এসে তার জানের রক্ত পানি ক'রে দিচ্ছে। এ হাঁক তার এড়াবার জো নাই। সে লিখে দিয়েছে 'হাজাশুকা অনাবৃষ্টি কোন কিছুরই আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না।' এ কথার খেলাপ সে

করবে কি করে ? সে যে একেবারে বাঁধা। ঐ বল্‌ছে "চল কাছারী — আর পেয়াদার রোজ দাও"— তার পরাণ একেবারে কেঁপে উঠেছে। ঘরে ঘরে একটী পয়সা নেই, 'রোজ' কোথা থেকে দেবে ?' তবু হাঁক দিচ্ছে 'চল কাছারী ?' সে যে বড় ভয়ানক জায়গা ! "বেটা কবে দিবি বল্—এখনই দিতে হবে—নজর দে—না হয় ত বন্ধ করে রাখব। তামাদী এসে গেল যে !" এ কথার জবাব কে দেবে ? চাষা ত ডরে কাঁপ্‌ছে। আইনের বিরুদ্ধে চাষা গোমস্তা নায়েবের আঁধার কুঠুরীতে আটক থাক্‌ছে। তার হ'য়ে দু কথা বল্‌ছে কে ? সে বাড়ী যেয়ে থালা বটি যা থাকে তাই বেচে নায়েবের ঘরে নিয়ে উপস্থিত কচ্ছে। যেয়ে দেখে সুদ, হিসাবানা, কিস্তি খেলাপী কতক গুলির মবলগ বেঁধে নায়েব পেয়াদার হাতে দিচ্ছে। পেয়াদার কড়াকড়ি কি ! সে ত মনে হয় যমের বাড়ীর কেউ হবে।

এবার বাড়ী এসে স্ত্রীর দুএক খানি গহনা যা থাকে তাই বন্ধক রাখতে হীরুপালের বাড়ী যায়। একেবারে চিরদিনের তরে হীরুপালের সিন্দুকে সে গহনা বন্ধ হয়ে থাকে।

জমিদার কর্ত্তব্যহীন হয়ে জমির কোন উন্নতি কচ্ছে না। প্রকৃতি নিজেও গতি থামাচ্ছে না। চাষা আর কত পারবে ? সে খাটছে কিন্তু জন্মাচ্ছে কম—জমির শক্তি চিরদিন ত সমান থাকতে পারে না। কাজেই জমি দিচ্ছে কম। চাষা কম পায় কিন্তু দিতে হয় সেই পূর্ব্বেকার হিসাবে। জমিদার এ বিবেচনাটুকুও করেন না। প্রতি বৎসর এইরূপে চাষা কম খেতে পায়। এ ছাড়া এই জমির ফসলের উপরই তার সকল অভাবের নিবৃত্তি নির্ভর করে। ফসল দিয়ে তার আচ্ছাদন আন্‌তে হয় বিদেশ থেকে। বিদেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক সময় তার আচ্ছাদন প্রভৃতি সামান্য দু একটা অভাব নিবারণ করবার উপকরণ অতি দুর্ম্মূল্য দিয়ে জোগাতে হয়। এর জন্য তার তৈরী ফসলের অনেক বিদেশে

চলে যায়। আহারের জন্য থাকে তার যৎকিঞ্চিৎ। এই সামান্য আহারে তার পরিপুষ্টি হবে কি করে? তার শরীরে শক্তি হবে কোথা থেকে? আর এই দুর্ব্বল শরীরে শক্তি কোথায় রোগের হাত থেকে বাঁচতে? বাংলার চাষা মরছে চিকিৎসার অভাবে যত, তার দশ বিশ গুণ মরছে শক্তিহীনতার কারণে। তাই কৃষির উন্নতি চাই বেশী ফসল উৎপাদন করবার জন্য—চাষার শেখা চাই জীবন যাপন করবার কৌশল—তার শেখা চাই আচ্ছাদন তৈরীর কায়দা। তার নিজের অভাব নিজে নিবারণ করবার জন্য তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। সে বিদেশে তার তৈরী ফসল পাঠিয়ে দিয়ে বিলাস সামগ্রীর আমদানী করতে পারবে না। তবে সে বেশী খেতে পাবে—বেশী খেতে পেলে সে রোগমুক্ত হবে - সে বাঁচ্‌বে।

এ কর্ত্তব্য এখন কে পালন করবে? চাষার উদর পূর্ত্তির ভার কাদের উপর? চাষার স্কন্ধে বসে আছে যারা তাদের। তারা চাষাকে আর উপেক্ষা করতে পারবে না। তারা অনুৎপাদক হয়ে চাষার উপর নির্ভর করতে পারবে না। চাষারা উৎপাদন করছে কিন্তু তারাই ভোগ করছে শুধু চাষার উপর চোক রাঙ্গিয়ে। তারা যে প্রকৃত দোষী তা তাদের হুস্ নাই। তারা চাষাকে তার সমুদয় অধিকার হতে বঞ্চিত ক'রে তাকে খাটুনির প্রাণীতে পরিণত করে তুলেছে। এর জন্য কি অনুতাপ করতে হবে না? এখনও চাষা তার নিজের অধিকার কি শিখতে পেলে না। তাকে শুধু—'ভোট' দেওয়া শিখালে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন শেষ হবে না। ঐ 'ভোটের' পিছনে তার একটা আত্মশক্তি - একটা বিরাট মানুষ, ঐ চাষা বর্ব্বর শরীরটীর মধ্যে সুপ্ত আছে সেকথা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। শুধু কোট প্যাণ্ট পরে 'ভোট' আদায় করে বেড়ালে তাদের অধিকার দেওয়া হবে না। এ ভুল পশ্চিমের Democracy বুঝতে পেরেও পারেনি। আমরা আবার সে ভুল না করে বসি। আমরা অনেকে ভোটের মোহে মুগ্ধ

হয়ে Democracy র আগমনী গেয়ে আত্মহারা হয়ে উঠেছি কিন্তু তাতে আমাদের মস্ত ভুল হবে। এ ভুল সংশোধনের ভার জমিদার তালুকদারের উপর ন্যস্ত।

হে জমিদার! তুমি কি বুঝবে সে কর্ত্তব্য? তুমি পশ্চিমের Democracy কে হুবহু এনে বসিয়ে দিও না। তুমি মানুষ হিসেবে চাষার সঙ্গে বসে যেতে পারবে কি? তুমি তার সঙ্গে বসে মাটির বুকের গরম সহ্য করতে পারবে কি? তুমি তোমার বিপুলশক্তি বিলাস দেবতাকে বিদায় দিয়ে সিমলার পাহাড় কি দার্জ্জিলিং এর 'বাস' হতে নেমে আস্‌বে কি? তুমি চাষার ভগ্নকুটীরের মগ্ন আতিথ্যকে গ্রহণ করতে রাজি হতে পারবে কি? তুমি ম্লান চাষার মলিন মুখের কষ্টের হাসিকে সহজ সরল করতে পারবে কি? তুমি চাষার বুকে সাহস দিয়ে তার তিরস্কার শুনে, আপনার কর্ত্তব্য হীনতা স্মরণ করে, অনুশোচনা করতে জান কি? তুমি চাষার ক্লেশে নিজ ক্লেশ বোধ করতে পার কি? যদি এসবের কোনটীর শক্তি তোমার না থাকে তবে আর Democracy র কথা তুমি বল না—ভোটের জন্য আর টাকা ব্যয় করে তোমার প্রজা বাংলার চাষাকে আর বিব্রত করো না। তুমি তাহলে বুঝলাম বাংলার চাষাকে বলশী করে তুল্‌বার জোগাড় করেছ। এখন যতই তুমি তোমার পুরাতন গতিতে চল্‌বে ততই সে দিন নিকট করে তুলবে, যে দিন বাংলার বুকে বলশীর বিপ্লব নিদারুণ হয়ে প্রতি পল্লী অশান্তির কলরোলে মুখরিত করে তুল্‌বে। বাংলার চাষা মানুষ। তাদের অন্তর মানুষ আর সুপ্ত হয়ে থাকতে চাচ্ছে না। চাষার শরীর গেছে কিন্তু তাই বলে তার অন্তর মানুষটী একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েনি। তাদের অধিকার তারা ভোগ করতে চায়। তারা সকল দেনার জন্য দায়ী হবে কিন্তু পাওনা তার অদৃষ্টে থাক্‌বে না, একথা তারা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চায়। তারা মানুষ হয়ে সমান

অধিকার পেতে চায়। তারা বুকের রক্ত দিয়ে উৎপাদন করে সকলকে খাওয়াচ্ছে কিন্তু নিজে অনশনে অর্দ্ধাশনে ঋণ জর্জ্জরিত হয়ে উদ্বিগ্ন রজনী পোহাচ্ছে। এ অসমান অবস্থা আর কত দিন? জমিদার ও চাষা এই দুই শ্রেণীর সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বাংলার বলশীদের সর্ব্ব প্রধান নীতি হবে! এই নীতিবলে পূর্ণ কল্যাণের যুগ সৃষ্টি করবার জন্য উন্নত হয়ে প্রবল উৎসাহে, বিপুল তেজে ও চিরসঞ্চিত অধীরতার স্রোতে বাংলার বলশীরা তাদের ক্ষোভ, নির্য্যাতন ও অসহায়তার নিষ্ঠুর অভিনয় করবে। এর জন্য কে দায়ী হবে তা ভবিষ্যৎসমাজের নেতৃবর্গ নির্দ্ধারণ করবেন।

—— —()— ——

কৃষকের আর্ত্তনাদ

শহর বা শহরতলীতে বাস ক'রে যাঁরা আপনাদিগকে নন্দনকাননের অধিবাসী ঠাউরে ব'সেছেন তাঁদের কথা আমি বল্‌ছি না। তাঁরা বাপ পিতামহের বাস্তুভিটা পল্লীর বুকে উলঙ্গ ফেলে প্রকৃতির কোল ছেড়ে দিয়ে একেবারে হাত পা ধুয়ে শহরের হৃৎপিণ্ডে বাসা বেঁধে দিব্যি সুখে আছেন। তাঁরা গৈ গাঁয়ের কথা শুন্‌লে চোখ মুখ নাক রগড়ে দশবার "বিচ্ছিরি" কথাটার উল্লেখ না ক'রে চুপ থাক্‌তে চান না। লেখাপড়া শিখে কেরাণীর খাতায় নাম লিখে ঐ যে, গৈ-গাঁয়ের আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর ব'লে পরিত্রাণ পাওয়ার লোভে শহরের বাসা ভাড়া নিয়ে তাঁরা দিন আনেন দিন খান তাতে তাঁরা পরম সুখী মনে করেন! চাকরীর টাকার লোভে শহরের মরা মাছের ঝোল ও কাঁকর-ভরা চাল নাকে মুখে গুঁজে তাঁরা বাবু হ'য়ে কাছারী যেতে শিখেছেন। তাঁরা

আর গে-গাঁর কথা শুন্‌তে পারেন না। এইরূপে লেখা পড়া আমাদের পল্লী-জীবন শূন্যে করে ফেল্‌লে।

প্রকৃতির অত্যাচারের হাত হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে জ্ঞানার্জ্জন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। পল্লীর অধিবাসী প্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম যুদ্ধ ক'রে চলেছে। তাদের মধ্যে লেখাপড়া শিখে জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হ'য়ে প্রকৃতিকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য কেহই সেখানে থাক্‌ছে না। লেখা-পড়া যাঁরা শিখ্‌ছেন কাপুরুষের মত ভীত হ'য়ে পল্লীর বক্ষ উজাড় ক'রে অজ্ঞ চাষাকে ফেলে তাঁরা শহরের বুকে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যাচ্ছেন। প্রকৃতি ও অজ্ঞ চাষাদের ওপর আরও নিদারুণ হ'য়ে উঠ্‌ছে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ পাশকরা ছাত্রদিগকে ডেকে শেষ উপদেশ দিয়ে দেন, "বাপু সকল বাড়ী যাও, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যেয়ে পুরাতনকে নূতন ক'রে তোল, নির্জীবকে জীবন্ত করতে লেগে যাও—তোমার শিক্ষা তোমার কঠোর জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা পল্লীর নিঃসঙ্গ অজ্ঞতাকে সরিয়ে দিয়ে চাষার বুকে জ্ঞানের আলোক দাও—সে বাঁচতে শিখ্‌বে, তোমাদের আদর্শ দেখে তারা মানুষ হতে শিখ্‌বে--তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে এর চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট রূপে ব্যবহার কর্‌তে পারবে না—"রব্বুল আলামীনের" জ্ঞান আহরণ ক'রে যদি সেটাকে শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, শরীর সেবার ও ভোগের জন্য ব্যয় ক'রে যাও তা হলে তোমাদের মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।" এই উপদেশ মত কার্য্য করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট যুবকগণ স্ব স্ব পল্লীতে ফিরে গিয়ে পল্লীর বুকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পল্লীতে এখন দেখা যায় শহরের মটর গাড়ী, বেড়াবার পার্ক, চিকিৎসার হাস-পাতাল, স্কুল কলেজ, শিল্পাগার, কৃষিশালা, পশুশালা প্রভৃতি পল্লীর নিবিড় প্রকৃতির স্পর্দ্ধাকে উপহাস ক'রে দিনের সঙ্গে বেড়ে উঠ্‌ছে। তারা লেখাপড়া

শেখার উদ্দেশ্যকে চরম ক'রে সাধনার সামগ্রী করে তুলেছে ও তার সাফল্যও লাভ করছে

আর ভারতের লেখাপড়া শেখা নরনারী দাসখত লেখবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন। তাঁরা বাড়ী ফিরে একটু জুতা খুলে বেড়ালে নিজেকে কত হীন মনে করেন, ভয় করেন পাছে তাঁদের ভদ্র নাম ঘুচে যায়। পায়ে তাদের কাঁটা বিঁধে, কাদা জল লাগে—সর্দ্দি হয়—গেঞ্জি না প'রে অনাবৃত শরীরে বের হলে তাঁদের যেন ঘাড় কাটা যায়, অভদ্র হ'য়ে যাওয়ার এমনি তাদের ভয়। হাতে একটা কাজ করা ত দূরের কথা! দু-এক মাইল পায়ে হাঁটা তাঁরা না-পসন্দ করেন। তাঁরা শহরে এসে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন—জুতা খুল্‌তে হয় না—শরীর সর্ব্বদা ঢাকা থাকে। বেশ ফুল-বাবুটী হয়ে বসেছেন। বাপ-দাদার ভিটায় বন-জঙ্গল শিয়াল-কুকুরের আড্ডা হয়ে উঠেছে। সেখানে ঘুঘু চরে যায় তা দেখে কত গেঁগাঁর চাষা বুড়ী দুর্লক্ষণ গ'ণে হা-হুতাশ ক'রতে ক'রতে দেশছাড়া কেরাণী বাবুদের বাপ পিতামহের নাম ক'রে কত না দুঃখ করেন। তা বুড়ীদের ও দুঃখ শুনবে কে? সে আক্ষেপ ওই গাঁয়ের লতা-পাতা-বনে মিশে যায়ে। তাই বল্‌ছি—ঐ লেখা-পড়া শেখা বাবুর জাত পল্লী ছেড়েছে—আর মূর্খ চাষা নিঃসঙ্গ জীবন টেনে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে বুঝতে বুঝতে এদের কথাই বলবার জন্য আমি এই কাহিনী খুলে বসেছি।

শহরের বাবুদের কথা ব'লে কাজ নাই, সে আমি আগেই বলে রেখেছি। তাঁরা চাষা বল্লে নোংরা বর্ব্বর কদাকার বিশ্রী কুৎসিত এক-রকম জীবের ধারণা ক'রে বসেন। আমি চাষা বল্‌তে সে কথা বুঝতে চাই না এবং বুঝাতেও চাই না। তারা মূর্খ; সে তাদের অদৃষ্টের দোষ। তারা চাষ করে, তাই তারা চাষা। যারা মদ বেচে সমাজের অকথ্য অনিষ্ট করে চলেছে তারা ভদ্রলোক বাবু—যারা চাষার গর্দ্দান ভেঙ্গে

ফাঁকি দিয়ে চতুরতার বাহাদুরী নিয়ে দু-পয়সা জমিয়ে লালঘর তৈরী করে তারা বহু মানাস্পদ হয়ে টিকে থাক্‌ছে—তারা অসহায় মূর্খ নির্ব্বোধ চাষার রক্ত শোষণ ক'রে নিয়ে ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে—আর আজ চাষা নিজের সকল শক্তি ব্যয় ক'রে সারা সমাজটীর খাদ্য তৈরী ক'রে দিয়ে মানব দেহ ও মনকে বাঁচিয়ে রাখে। সে "চাষা" হয়ে ঐ বাবুদের তিরস্কার, অবজ্ঞা, ঘৃণা, নির্য্যাতন সহ্য ক'রে যায়। এ অন্যায়ের প্রতিবিধান কবে হবে? যে দিন চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে শহরে যাবে না—ফিরে এসে হাল ধরে মাটির শক্তিকে প্রখর ক রে তুল্‌বে সে দিন ভদ্র বাবুদের অনুশোচনার দিন আস্‌বে। সে দিন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন এসে যাবে। সে দিন বড়মিয়া, সেজে বাবুর দুর্ব্বোধ্য কঠোর-নিষ্ঠুর উপদেশ চাষার বুকে বজ্র হান্‌তে থাক্‌বে। সে তা বুঝতে পারবে, সে মূর্খ হ'য়ে আর থাক্‌বে না, সে আর বাক্‌হীন চলিত বলদের মত ঘুরতে চাইবে না—সে দিন মহর বিশ্বাস, আর চারু বাবুর নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দিন ফুরিয়ে যাবে—তাদের রক্ত শোষণ বৃত্তি অতিনির্দ্দয় ভাবে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিতে লেগে যাবে। আসিবে কি সে দিন যে দিন চাষার ছেলে গ্রাজুয়েট হয়ে অন্তরের সহিত চাষা নাম বরণ ক'রে সমাজের খাতায় তাদের নাম 'সবার উপরে' বড় ক'রে লেখার প্রয়াস পাবে, তার চাষা নামের ওপর শ্রদ্ধা জন্মাবার জন্য চাষার মহৎ জীবনকে মহীয়ান্, গরীয়ান্ ক'রে তুল্‌বে—তাদের প্রাচীন গৌরবকে উদ্ধার করবে? জানিবে কি না তারা যে, সমাজের সকল অভাব পূরণের ভার খোদা তাদের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন? জানে না কি তারা—তিনচতুর্থাংশ মনুষ্যজীবনের আহার সংস্থানের বিরাট দায়িত্ব তাদের ওপর পড়েছে? বুঝ্‌কে কি তারা—এত কাজের হ'য়েও সমাজে কেন সকলে তাদিগকে পায়ে ঠেলে রাখে? এতটুকু কি বুঝতে তারা জানবে না, কেন সবাই তাদের অজ্ঞ-

তার সুযোগ নিচ্ছে ? চাষার ছেলে আজ লেখপড়া শিখে সোনার জমি ফেলে রেখে আয়েশের জন্য লালায়িত হ'য়ে হীন কুশ্রী বিরামহীন কেরাণী জীবনের শস্তধিক্কারকে বরণ করে নিচ্ছে। কেন ? আমাদের শিক্ষা এই দিচ্ছে।

এই কি শেষ ? না, এ শিক্ষার কুফল যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর স্তরে স্তরে কতদূর প্রবেশ করেছে তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। ঐ চাষার ছেলে যখন পিতামাতার কুটির ছেড়ে শহরে উঠে সভ্য হয়ে বসে, তখন পিতার পরিচয়টা পর্য্যন্ত দিতে সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হয়ে মুষড়ে পড়ে। নিজেকে কতই হীন মনে করে। হা চাষাপুত্র ! তুমি এতবড় মহৎবৃত্তি পরায়ণ মানুষের সন্তান হয়ে নিজের পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ কর ! ধিক্ তোমার জীবন, শিক্ষা ও জ্ঞানকে ! তুমি চাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জীবন ও বৃত্তিকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা না ক'রে— তুমি কল্যাণের দাতা হ'য়ে পৃথিবীর বুকে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা, যাবতীয় সুযোগকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে মোহময় ভদ্রতার কৃত্রিমতা ও নিরর্থক জীবনের প্রভূত অনাবশ্যকতাকে যদি বুক পেতে বরণ ক'রে লও তাহলে তুমি যথার্থই কৃপার পাত্র। তুমি বুঝছনা তোমার মূল্য, জান্‌তে পাচ্ছ না তোমার প্রয়োজনীয়তা,—চিনতে পাচ্ছ না তোমার স্থান। তাই তুমি খাতার বুকে কলম লাগিয়ে বিরাট মানবাত্মাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মেরে ফেলবার জন্য ব্রতী হয়ে গিয়েছ। কবে তুমি কলম ছেড়ে হাল ধ'রে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের ধারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অফুরন্ত আনন্দকে বুকভরে ভোগ কর্‌তে পারবে ? কবে তুমি তোমার চাষাবৃত্তির অসাধারণ অনুপম সার্থকতা বুঝবে ? কবে তুমি নীরস নতিথাতা ছেড়ে শহরের জটিল, কপট, নিষ্ঠুর সঙ্কীর্ণ, অভাবক্ষুব্ধ, ক্লান্ত একঘেয়ে চিন্তাম্লান জীবনকে ছেড়ে, পল্লীর নগ্ন-সরলতা, সৌভাগ্যদীপ্ত অফুরন্ত আয়োজনকে ভালবাসতে

চাষা ও জমি

পারবে? যত দিন শহরের বহিশ্রীর ওপর তোমার বিতৃষ্ণা না জন্মাবে ততদিন আমার এ প্রশ্নের কোন মূল্যই হবে না! যাক্ যে কথা বল্‌ছি, ঐ যে চাষা একা পড়ে আঁধারে মরে-বেঁচে ধুক্‌ধুক্ করছে তার অবস্থাটা একবার দেখা যাক্।

যারা মাঠ পাড়ি দিয়ে গৈ-গাঁয়ে চলা-ফেরা করে তারা মাঠের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট চলবার পথ পায় না। প্রতি বৎসর নূতন নূতন পথের সৃষ্টি হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সকল পথ লাঙ্গলের হাতে একে একে বিদায় গ্রহণ করে। তখন পথিকেরা নূতন পথ আবিষ্কার ক'রে ব'সে। এই পথ আবিষ্কার কর্‌তে গিয়ে পথিককে ক্ষেত ওয়ালাদের সঙ্গে কত বিবাদ করতে হয়। এই বিবাদ যে একটু গুরুতর রকমের হয়ে ওঠে এবং সময় বিশেষে যে অত্যন্ত বিপজ্জনকও হয় তা গৈগাঁয়ের বাসিন্দারা বৎসর বৎসর দেখ্‌তে পায়। ক্ষেতওয়ালা ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে কাঁটা দিয়ে পথিকের পথরোধ করে আর পথিক পথ না পেয়ে কাঁটা সরিয়ে আর না হয় কাঁটা ডিঙ্গিয়ে ক্ষেতের বুক চিরে মাঠ পাড়ি দিয়ে চলে যায়। ক্ষেত ওয়ালার জমি ক'রে এত মায়া-বেড়ে গেছে—জমির মূল্য তার কাছে এত বেশী দাঁড়িয়েছে যে, একখানি পা রাখবার মত একটুখানি সঙ্কীর্ণ পথ ছেড়ে দিতে তার এত ব্যথা লাগে। ঐ বিঘৎ পরিমাণ পথ রুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে সে কি ভীষণ পরিশ্রমই না করে! সে সারা মাঠের কাঁটাগাছের কাঁটা কেটে কেটে সারা ক্ষেতের বুকে ছড়িয়ে রাখে। ক্ষেতের মাঝে ঘাসের আ'ল আর দেখা যায় না। এই আ'ল বাঁচাতে গিয়ে কত চাষার মাথা গেছে, আর কতজন শ্রীঘরের আতিথ্য ভোগ করেছে তার ইয়ত্তা কে করে? বঙ্গের প্রত্যেক জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তার হিসাব করা আছে। ছোটবেলা গরু আ'ল ধ'রে খাওয়াতে গিয়ে একহাত হতে দুহাত তিন হাত পর্য্যন্ত

চওড়া আ'ল কাঁচাসবুজ লম্বা লম্বা লক্‌লকে ঘাসে ভরা দেখ্‌তে পেয়েছি—ঘণ্টাখানিকের মধ্যে গরুর পেট উঁচু হ'য়ে ভরে উঠ্‌ত। কিন্তু সে আ'ল ধ'রে খাওয়ান' আর এখন নাই। আ'লই নাই যখন, তখন আর গরু খাওয়ান হবে কোথা থেকে। এখন আ'ল অভাবে জমির চিহ্ন রাখা শক্ত হয়ে উঠেছে। এজন্য চাষারা মাঠে প্রায়ই দাঙ্গা করে ফেল্‌ছে। পূর্ব্বে আ'লের বুক দিয়ে যাতায়াতের পথ থাক্‌ত কিন্তু এখন আর সে আ'লের চিহ্নমাত্র নাই—ক্ষেতের হৃৎপিণ্ড চেপে শস্যবনের মাঝ দিয়ে গতিবিধি সঙ্গত ক'রে নিতে হচ্ছে—এর জন্য কত জন যে গালাগালিও খাচ্ছে তা 'মাঠ-ফেরা' লোক মাত্রেরই জানা আছে!

এটা মনে কর্‌বেন না একটা সামান্য কথা! যতই সামান্য হোক্ এর দ্বারা আমি আপনাদের একটা পাশ্চাত্যের অর্থবিজ্ঞানের তথ্য প্রয়োগ কর্‌বার সুযোগ ক'রে দিতে পারব। চাষারা জমির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। জমি তার পরিশ্রমানুপাতে ফসল দিতে পারে না। সে যে পরিশ্রম ক'রে দশ বৎসর পূর্ব্বে যে ফসল পেয়েছিল আজ সে সেই পরিমাণ বা ততোধিক পরিশ্রম ক'রেও তার অর্দ্ধেক ফলস ঘরে উঠাতে পারে না। তার জমি কমেওনি বাড়েনি। তাই তার নিকট মাটির কণা সোনা হয়ে উঠেছে। সে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে পারে না—তার প্রাণ আঁতকে ওঠে। তার খাবার শস্য কোথা থেকে হবে এই তার ভয়। সে আগে কত জমি অকাজে 'বাঁচড়া' ক'রে ফেলে রেখে দিয়েছে—আজ সে এক ইঞ্চি জমিও বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সে তার ঘরের দুয়ারে এনে লাঙ্গল থামায়। তাকে এইরূপে সারাদেশ চ'ষে বেড়াতে হয়। গরুরও একবিন্দু দাঁড়াবার স্থান নাই। চাষার কি গরুর উপর নজর নাই? সে কি গরুর যত্ন করতে জানে না? কিন্তু করে কি ক'রে? আত্মরক্ষার্থে তার জমি ফেলে রাখবার জো নাই। সে সব চ'ষে খুঁড়েও তার

অন্ন সংস্থান করতে পারে না। 'ফেলান' জমি (fallow land) ফুরিয়ে উঠেছে। তাই জমির মূল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। 'ফেলান জমি' পূর্ব্বে বিনা খাজানায় পড়ে থাক্‌ত শুধু গরু ছাগল ভেড়ার জন্য ; কিন্তু সে ফেলান জমিরও মূল্য হয়েছে—আর চষা জমিরও মূল্য আটদশগুণ বেড়ে গেছে। রিকার্ডোর থিওরি (Ricardo's Rent Theory) পল্লী মাঠের অবস্থা, চাষার দুর্দ্দশা ও গরুর আহারের দুষ্প্রাপ্যতা হ'তে সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে পারে। রিকার্ডোর চতুর্থ শ্রেণীর অকেজো জমি আর আমাদের 'ফেলান' জমি এক। জমির সাপ্লাই যদি বেশী হয় তাহলে ফেলান জমির দিকে কেহই যায় না। সকলেই উৎকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি গ্রহণ করে। তার মূল্যও তখন কম থাকে। পরে যখন জমির শক্তি কম্‌তে লাগে আর ফসল কম হয়ে চাষার খাঁটুনির পেট ভরতি করতে পারে না, তখন চাষা জমি বাড়াবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে জমি উর্ব্বর কর্‌বার ও জমির নষ্টশক্তি উদ্ধার করবার জন্য কোন উপায়ই চাষার হাতে নাই ; কাজেই তারা অল্প জমিতে বেশী উৎপন্ন কর্‌তে পারে না। অল্প জমি হ'তে তারা ক্ষতিপূরণ ক'রে যথোপযুক্ত শস্য উৎপাদন কর্‌তে সমর্থ হয় না। তাই তারা ছুটে যায়—দুপাঁচবিঘা জমি বৃদ্ধি করে আবশ্যকীয় শস্য সংগ্রহ কর্‌বার জন্য, এবং নিরন্তর ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় শুধু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে তুলবার জন্য। তাই সে জমির প্রশস্ত আ'ল্‌ ভেঙ্গে ক্ষেতের সামিল ক'রে জমির পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে তুল্‌তে গিয়ে সমূহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। তাই সে বাগান কেটে সাফ ক'রে শস্য তৈরী কর্‌ছে—গরু চরাবার ক্ষেতকে চ'ষে ফেলে ফসলের ক্ষেতে পরিণত কর্‌ছে। এতেও কি বুঝা যাচ্ছে না জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমহ্রাসসাধন পূর্ণবেগে প্রকটিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে ?

যাকে পশ্চিমের কৃষিবিৎগণ বলেন 'Diminishing Productivity' সেই নীতি ও রিকার্ডোর খাজনা নীতি এক সূত্রে গ্রথিত। বঙ্গ পল্লীতে এই দুটি যমজনীতি চাষার ক্ষেত ও চাষার অবস্থা সপ্রমাণ করে দিচ্ছে। জমির উপর চাষার এমনি দম্ জমে উঠেছে যে তার স্বাস্থ্যের জন্য, তার সহজ সুন্দর চলাফেরার সুযোগ করবার জন্য মাঠের পাশ দিয়ে যদি জিলাবোর্ড একটা রাস্তা নির্ম্মাণার্থে সাধারণের জমির উপর থেকে মাটি কাটে, অমনি অল্পকাল মধ্যে চাষারা স্ব স্ব জমির খাদ বুজিয়ে দিয়ে বীজ ছড়িয়ে যায়—বর্ষা কালে আর রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায় না। জমি নিয়ে চাষা এমনি নির্ম্মম মমতায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে। এর পরিণাম জ্ঞান তার নাই—এর সংশোধনের গোড়া কোথায় তাও তাকে কেউ ব'লে দেয় না। দেশের নেতারা শুধু কমিটি ক'রেই পেট মোটা করে হাওয়া খেয়ে শহরের আলোকে চকচকিয়ে বেড়ান। এই নিষ্ঠুর জমিতৃষ্ণা নিবারণ করার ভার যাদের উপর তাঁরাও ঐ অলিমপিয়ায় ব'সে মজা লুটছেন। তাঁরা যদি জমির ক্রমহ্রাসধর্ম্মকে নির্ম্মূল ক'রে 'ঘন চাষের' (intensive cultivation) ব্যবস্থা করতেন তাহলে জমির উপর অতৃপ্ত ব্যাপ্তি-আকাঙ্খা চাষার অনেকটা মিটে যেত। সে খেতে পেত আর তার কৃশ গরু মাঠ পেয়ে চরে ফিরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। সেও রুদ্ধশ্বাস হয়ে না খেতে পেয়ে জীবন্মৃত হয়ে মনিবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে সমভাবে কৃশাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। আমি বলতে চাই এখন, চাষার ক্ষেত Diminishing productivityর সঙ্গে বিষম বিরোধ ক'রে চলছে। উৎপন্নের ক্রমহ্রাস প্রাপ্তি এই নিটুট সত্যটা বৎসর বৎসর চাষারবুক ভেঙ্গে দিচ্ছে শস্যের অল্পতা দিন দিন নিদারুণ হয়ে চাষাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাচ্ছে—এই অল্প শস্যের জন্যও তাকে চিরস্থায়ী করের উপর বিবিধ 'বাড়তি' cess and abwab দিয়ে জমিদারকে তুষ্ট রাখতে হচ্ছে—তা না হলে তার

উপর 'উচ্ছেদের' (Ejectment) নোটিশ জারী হয়ে বসে। আদালতের পেয়াদা বাড়ীর উপর এসে চেপে বসে। অবশেষে তাকে ভিটে ছেড়ে খাঁটুনি বেঁচে দিন গুজরান করতে হয়। আর যদি জমিদার তার প্রাপ্যটা আদায় করতে পারে তখন মহাজন এসে তাকে চেপে ধরে সুদ আসলের জন্য। অন্য ফসলের জন্য খাজনা দিতে গেলে চাষাকে হয় আগে শস্য বেচে পরে মহাজনের লাঞ্ছনা খেয়ে টাকা কর্জ্জ ক'রে তাই দিয়ে আহার কিন্‌তে হয়, না হয় আগেই কর্জ্জ করে জমিদারকে বিদায় করতে হয়। চাষা আর স্ফূর্ত্তি করবার জন্য, বেহুদা খরচের জন্য কর্জ্জ করতে কমই যাচ্ছে। তার জমির চাষ করতে হচ্ছে অতিরিক্ত খরচ ক'রে। সে খরচ সে জোগাবে কোথা হতে? তার সকল অর্থই ব্যয় হ'য়ে যাচ্ছে ঐ লাঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে। সে পাঁচ হাতের গামছা ছাড়া একখানা লম্বা কাপড়ও পরতে পাচ্ছে না—শীতের সময় আগুনের কুণ্ড করেই রাত পোহাচ্ছে আর রোদের গরমে দিন কাটাচ্ছে—দুখানা কাপড় এক সঙ্গে সে পরতে পাচ্ছে না। তার মূল্য কোথা হতে সে জোগাবে? জমির ফসলের উপর তারআবশ্যক-বিলাস (Necessary luxury) সমস্ত নির্ভর কর্‌ছে। তারপর এই ফসলের বৃদ্ধি কল্পে জমির শক্তিকে বাড়াবার জন্য সে যে কর্জ্জ কচ্ছে সে তা পরিশোধ কর্‌তে পারে না। বৎসরের মধ্যে নৃশংস মনুষ্যকীট মহাজন দশগুণ দেনার দায়ে বেচারার 'যা কিছু সব' বিক্রী ক'রে তাকে নিজের বাড়ী বেতন ভোগী ক'রে রাখে। তারা ঋণের ফাঁদ বেশ তৈরী করেছে। টাকা দেওয়ার সময় তার দুএক বিঘা জমি যা থাকে সেই মূক মাটিকে জামিন (Surety) ক'রে দুষ্ট মহাজন মহাখুসীতে খত লিখ্‌ছে।

নররক্তপিপাসু যত পারে ততই দুরূহ শর্ত্তে খতের বর্ণনা খতম ক'রে তবে ছাড়ছে; আর চাষাকে না বুঝিয়ে না শুনিয়ে খতের উপসংহার

করছে এই ব'লে 'অত্র খত দাতাকে পাঠ করিয়া শুনাইলাম।' হা
হতভাগা চাষা, নিরেট মূর্খ তুমি! তাই তোমার অজ্ঞতার সুযোগ কত
ভদ্র লোক নিয়ে নিজের পাপাচারের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে!
তুমি পড়তে জান না—তুমি শুন্‌তেও চাও না—তুমি তোমার হিতৈষী
বাবুর কথায় মেতে উঠ—কাজেই 'বাবু' তোমার সর্ব্বনাশটা কর্‌তে
একবারও কুণ্ঠা বোধ করে না। এই চাষার উপর জুলুম ক্রমশঃ ঘনীভূত
হ'য়ে বাবুর মহল শহরের বাজারে সর গরম করে তুলছে; আর চাষার পল্লী
'আল্লা' 'আল্লা' ক'রে কাক, কোকিল, শালিক ও ঘুঘুর চেঁচামেচিতে
আকুল হ'য়ে উঠছে।

জমি ও গরু

বর্ত্তমান ভারতে কৃষির অবনতি ঘটেছে গরুর অভাবে। কৃশ বলদের দ্বারা চাষ ভাল হয় না—অনেক স্থলে বলদের পরিবর্ত্তে গাভী লাঙ্গল টান্‌তে লেগেছে! সে তার দুধ দেওয়া কাজ হ'তে অবসর, অব্যাহতি পেয়েছে—তাকে এখন দুঃসহ লাঙ্গলে কাঁধ লাগাতে হয়েছে। ওদিকে দুধের অভাবে চাষার 'জান' শুকিয়ে উঠেছে—তার শিশু কেঁদে কেঁদে কাঠ হ'য়ে চিরদিনের জন্য শান্ত হ'য়ে থাক্‌ছে। গরুর দুর্ব্বলতার জন্য কৃশ চাষা এক বিঘা জমির চাষ করতে বেলা আড়াই প্রহর ক'রে ফেলছে। দশ বৎসর, বিশ বৎসর আগে সে অতি অল্প সময়েই, ঐ পরিমাণ জমির চাষ সম্পন্ন ক'রতে পারত। কামারের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হ'লে যেমন লোহা তার নিকট অত্যন্ত কঠিন মালুম হয়, সেইরূপ চাষার দুর্ব্বল রুগ্ন অভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত শরীরের নিকট জমি ভয়ঙ্কর শক্ত হ'য়েদাঁড়িয়েছে। গোজাতি স্ত্রীপুরুষ মিলে এখন শুধু চাষার খোরাক সংগ্রহ করতে লেগেছে। নিজেদের আহারের জমি চ'ষে ফে'লে চাষার তথা

IMPERIAL

শহরের বাবু সমাজের সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি তাদের কর্‌তে হচ্ছে। ওপারে যেমন শ্রমী নরনারী ঘর ছেড়ে কলে ঢুকে প'ড়ে তাদের অতিপিপাসু মালিকের লাভতৃষ্ণা বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু নিজেরা খেতে পাচ্ছে না, এপারে তেমনি গরু স্ত্রীপুরুষ চাষার সাথে মিলে 'ভদ্রলোকের বাবুগিরি ও বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে তার নীচাশয়তা ও অমানুষিকতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবু তথাকথিত ভদ্রবাবুরা আসমানে চোক তুলে ও কপালে চশমা ঠেকিয়ে চাষার উপর রাগ জারি করে কি আস্পর্দ্ধার সঙ্গে! "ব্যাটা চাষা কোথাকার!"—এই হচ্ছে চক্‌চকে ধবধবে ভদ্রবাবুদের মিষ্ট সম্বোধন! পথনষ্ট ক'রে চোক রাঙ্গাবার ব্যাপার আর কি! চাষা রোদে পুড়ে ক্ষেত খুঁড়ে খেটেখেটে সারা হ'য়ে গুছিয়ে আন্‌বে আর বকুনি শুন্‌বে বাবু মিয়াদের,—কি অপরাধই যে তার তা কে বলে? মানুষ ব'লেই তাকে স্বীকার করতে তাদের যেন সকল অন্তরটি কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে।

এমনি অভাগা এই বাবু সমাজটা! বেঁচে থাক্ আমার চাষা! গরুর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় কৃষির অধঃপতন হচ্ছে। চিকিৎসা অভাবে পল্লীগ্রামে গরু ওলাওঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগে এত স্বভাবিক মৃত্যুর কবলে পড়ে যায়, তাতে যে কত গরু দিন দিন কমে যাচ্ছে— যথেষ্ট কাঁচা ঘাসের অভাবে কৃত গরু যে কৃশ হ'তে কৃশতর হয়ে পড়ছে—সে সম্বন্ধে একটী লোকের মুখে একটী কথাও শুনা যায় না। কত বড় বড় লোক কত কমিটির মেম্বর হ'য়ে গভর্ণমেণ্টের মাথায় যাবতীয় দোষ দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ কচ্ছেন ও নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন শেষ হ'ল ব'লে বিবেচনা করে প্রচুর দেশ-সেবার আত্ম প্রসাদে ভরপূর হয়ে বার উঠ্‌ছেন। তাঁরা প্রজার পক্ষ সমর্থন করতে যান কিন্তু কমিটির রিপোর্ট করেই তাঁদের সব কাজ শেষ হয়ে যায়। মনে করেন কমিটি নিযুক্ত হ'লে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কথায় বৈকুণ্ঠ গ'ড়ে তুলবেন।

হা অদৃষ্ট! তাঁরা যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করতে একবারও প্রয়াস পান না। এই যে গবর্ণমেণ্ট পশু-চিকিৎসক প্রতি মহকুমায় নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা শুধু বেতন ভোগ কচ্ছেন আর গোটাকতক শহরের ছেঁকড়া গাড়ীর ঘোড়া দেখতে গিয়ে বেচারী কোচয়ানকে ফাইন ক'রে বস্‌ছেন। এই ত তাঁদের কর্ম্ম। আর একটু অনুগ্রহ যদি করেন তবে ডেপুটী না হয় মুনসেফ-বাবু কি জমিদারের গাই গরুটার চিকিৎসা করতে বের হন! পল্লীর সহস্র সহস্র দুর্ভাগা গরু যে হাতুড়ের চিকিৎসার উপর নির্ভর ক'রে ভীষণ মহামারি পাড়ি দিতে থাকে তার চিকিৎসা কে করছে? গো চিকিৎসক বাবু শহরের চার দেওয়ালের বাইরে যেতে চান না—ওযে পাড়াগাঁ, পায়ে কাদা লাগে, জুতা খুল্‌তে হয়। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার বাবু পল্লীর বুকে স্বাস্থ্য টিক্‌বে না বলে ঐ শহরের রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে টেবিলের ওপর পা লম্বা ক'রে বসে থাকেন। পল্লীর চাষা প্রকৃতির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে ব'সে আছে তাতে তারা দলে দলে মরছে; গ্রাম কি গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে,—ভিটা বাস্তু জঙ্গলে কাঁটায় ভরে উঠে গাঢ় আঁধারের আবাস ভূমি হয়ে পড়েছে। ক'জন ডাক্তার তাদের রক্ষা করছে? তারা কৃশ দুর্ব্বল হচ্ছে কেন? প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ক'রে তার প্রতিকার করতে উঠেপড়ে লেগে যাও তবে প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। যদি একবার শহর ছেড়ে পল্লীর হাওয়ায় গা খুলে চাষার কুঁড়ের ভিতর ঢুকে তার বহুদিনের জমান অন্ধকার বুক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই নিবিড় আঁধারের আত্মার মধ্যে চাষার সমূহ বিপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে পার তবে তুমি চাষার প্রতিনিধি হতে পারবে। তবে তার হিতৈষী হ'য়ে তার মঙ্গলের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গের চাষাসমাজের জন্য জগতের সমক্ষে মানব সমাজের মধ্যে একটা চমৎকার মনোরম স্থান তৈরী করে দিতে পারবে। তবে তার দুঃখের কালিমা অন্তরের নির্য্যাতন নীলিমাকে একেবারে ঘুচিয়ে দিতে পার্‌বে।

আমি আমার যাবতীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে যত বারেই কৃশ বলদ ও রুগ্ন চাষাকে দুপুরবেলা ক্ষেতের বুকে লাঙ্গল চষতে দেখেছি তত্তবারই আমার নিকট ঐ একটা কারণ প্রত্যক্ষ শরীর পরিগ্রহ ক'রে মূর্ত্তিমান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেটা ঐ জমির 'Diminishing productivity' প্রাপ্তি অর্থাৎ মানুষ যেমন শৈশব হতে নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, প্রস্তর যেমন পর্ব্বত হ'তে গড়িয়ে আস্‌তে সুগোল মসৃণ হয়ে যায়—মৃত্তিকারও তেমনি একটা উৎপাদিকা শক্তির সীমা আছে। মাটি জগতের সর্ব্ব বস্তুরই মত,— একেবারে অক্ষয় হ'য়ে আসে নি। তার ভিতরকার সকল শক্তি প্রতি বৎসর ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে আসছে। যতটা ব্যয় হ'য়ে যায়, ততপরিমাণ খাদ্য মাটিকে দেওয়া হয় না। যৎকিঞ্চিৎ সার কি করতে পারে? আমরা দিন রাতের মধ্যে কতবার খাচ্ছি, যদি একটিবার না খাই অমনি কত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। তদ্রূপ বাংলার মাটি, ভারতের মাটি, শুধু খেটেই চলেছে কিন্তু খেতে পাচ্ছে অতি সামান্য। তার ফল ধীরে ধীরে বেশ বিপুল হ'য়েই দেখা দিয়েছে। এই উৎপাদিকা শক্তির ক্রম-হ্রাস প্রাপ্তি ঘটায় চাষা অধিক পরিমাণে জমি সংগ্রহ করতে লেগেছে। সে বন কাটছে—'ফেলান' জমি উঠছে—সে আ'ল ভাঙ্গছে পথ মারছে—রাস্তা সরিয়ে নিচ্ছে—গরু বাঁধবার বাঁচড়া কেটে ফেল্‌ছে। সে খাদ্যের জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। তবু সে যথোপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে ঋণে আবদ্ধ হচ্ছে। পল্লীবাসী কে না দেখেছে চাষারা কত ধানের গোলা বিক্রী ক'রে ফেল্‌ছে—কত নষ্ট করে ফেল্‌ছে। যারা পুরাতন গোলা কিন্‌ছে তারা চাষার রক্তের ব্যবসায় দার। চাষা চষে চষে পূর্ব্বেকার মত ফল পাচ্ছে না ব'লে গোলা বেচে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এই করতে গিয়ে গরুর চরবার স্থান গরুর আহারের জমি চাষা নিজের আহারের ক্ষেত ক'রে তুলছে। কত মাঠ ছোট বেলা শূন্য পড়ে থাকতে

দেখেছি। পূর্ব্বে যে মাঠ গরু ছাগলের দল বুকে ক'রে দিগন্ত ব্যেপে পড়ে ধূ ধূ করত—অসংখ্য গাভী, বলদের দল ঘুরে ঘুরে চ'রে চ'রে মাঠের কাঁচা ঘাস খেয়ে ম্লান রবির নগ্নরঙিনতায় রাঙান সান্ধ্যগগনকে পিছনে ফেলে বাড়ী ফিরত—সেই সব মাঠ আজ চাষার ফসলের ক্ষেতে শ্যামল হ'য়ে খেল্‌ছে। সে কাঁচা ঘাসের সবুজের খেলা আর এখন দেখা যায় না। গরু খেতে না পেলে কি না খেয়ে সবল সুস্থ হবে? না খেতে পেলে রোগের হাত হ'তে মুক্তি পাবে কি করে? চাষাও যেমন ঋণের দায়ে বাগ্র হয়ে মহাজনের কালপাশ ছিন্ন করতে গিয়ে অর্দ্ধভুক্ত থেকে রোগের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে না পেরে অকালে ইহলোকের মায়া কাটাচ্ছে, তেমনি গরু তার সাধের ক্ষেতকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে ও অর্দ্ধাশনে স্বাধীন ভাবে চরতে ফিরতে না পেরে সারাদিন খেটে খেটে কৃশাঙ্গ হ'য়ে পড়ছে আর এক একবার ইন্‌-ফ্লুয়েঞ্জার মত মড়ক এসে চাষার গোয়াল ঘর শূন্য ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। চাষাকে গরু পুষতে হচ্ছে কিন্তু তাকে খাওয়াতে পারছে না। নিজেও খেতে পাচ্ছে না, গরুও খেতে পাচ্ছে না। গরু যা পায় তাতে তার যথেষ্ট হয় না। আর বৎসরে সকল সময় সমান ভাবে খেতে পায় না। চাষা যেমন মাঘ ফাল্গুন মাস হ'তে মহাজনের বাড়ী ধরনা দিতে আরম্ভ ক'রে ও কর্জ্জ ক'রে খেতে আরম্ভ করে তেমনি গরুও শীতকাল হতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গৃহস্থের শুষ্ক খড় বিচালির উপর নির্ভর ক'রে থাকে। যে চাষার খড় বিচালি থাকে না ও অর্থাভাবে কিন্‌তে পারে না সে ঐ অন-শনক্লিষ্ট গাভী কি বলদকে লাঙ্গলের সঙ্গে যুতে দিয়ে রৌদ্র তপ্ত কঠিন মাটির বুকে চাষ ক'রে বাড়ী ফিরে পরিশ্রমের সমানুপাতে খেতে পায় না। তবে তারা বাঁচবে কি ক'রে? আমার যতদূর বিশ্বাস মাটি খেতে পাচ্ছে না ব'লে চাষাও ক্ষীণ হচ্ছে ও গরুও প্রকৃতির নির্য্যাতন হ'তে রক্ষা পাচ্ছে না।

এমত অবস্থায় জমির উন্নতি সাধনের ভার যাদের উপর বহুদিন থেকে দেওয়া আছে সেই কর্ত্তব্যবিমুখ নিষ্ঠুর জমিদারকে যদি কোন ক্রমে তার কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত করা যায় তাহলে জমির উন্নতি হবে—মাটির উর্ব্বরতা বেড়ে যাবে, চাষা অল্প চাষে বেশী উৎপন্ন করতে পারবে; তখন প্রত্যেক মাঠের মধ্যে এক একখণ্ড জমি গরু চরাবার জন্য পৃথক ক'রে রাখতে পারবে, গরুর যত্ন হবে, গরু খেতে পাবে বেশী। গাভী তখন পুনরায় তার প্রাচীন দুধ দেওয়া কাজে লেগে যাবে—সে কাঁচা কাঁচা সবুজ সবুজ ঘাস খাবে আর ভাঁড় ভাঁড় দুধ দেবে, চাষা খেয়ে শান্ত সন্তুষ্ট হবে—ছেলে খেয়ে মরণের হাত এড়াবে। আপন স্ফূর্ত্তিতে পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে সোৎসাহে নবনব কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার ক'রে দশ বিশগুণ বেশী শস্য উৎপাদন করে হ্রাসনীতি Diminishing productivity কে পরাজিত ক'রে বর্দ্ধন নীতি Increasing productivity কে জয়যুক্ত ক'রে তুল্‌বে। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' হয়ে উঠবে আবার এই বাংলার পল্লী। চাষা খেতে পেয়ে শক্তিমান্ হয়ে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। হঠাৎ তাকে আর অকালে কাল কবলিত হ'তে হবে না।

জমি ও সার

উৎপাদিকা শক্তি জমির ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় চাষার খোরাক কমে গেছে তা আমরা দেখলাম। এই শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চাষা বৎসর বৎসর প্রাণপণ চেষ্টাও করতে ছাড়ে না। সে গাড়ী ভরতি ক'রে গোবরের পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়েই 'সারদেওয়া' (manuring) ব্যাপারটা শেষ করে। কিন্তু গোবরে যে কতটুকু সার হ'তে পারে তা সে জানেই না। ছোট বেলা বাপ চাচাদের সার দিতে দেখেছে সেই সংস্কার ও অভ্যাস মত ঐ গোবরের সার ছাড়া আর কোন

পদার্থের যে সার হ'তে পারে এ কথা সে ভাবতেও পারে না জমিতে শস্যের কি কি খাদ্য থাকে ও চাষার সাধারণ শস্যের পক্ষে কোন্ খাদ্য শ্রেষ্ঠ তা বুঝ্‌বার শক্তি আমাদের চাষার নাই। কাজেই বৎসর বৎসর শস্যে কোন্ কোন্ খাদ্য জমির ভিতর হ'তে নষ্ট হয় বা কমে যায় তা সে না বুঝে গোবরের সার ছড়িয়ে যায়। এই সংস্কারগত অভ্যাসটী জন্মাবধি পেয়ে বসেছে ব'লে সে গাড়ী ভ'রে সার ব'য়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসে। এটা যে শুধু অভ্যাসের ফল তা সুস্পষ্টতর রূপে বুঝা যায় যখন তাকে প্রতি বৎসর একই পরিমাণ সার জমিতে দিতে দেখি। চাষার পিতামহ যে ভুঁইতে যে পরিমাণ রাশি রাশি সার দিয়েছে সেও সেই প্রকরণে সেই পরিমাণেই সার দেয়। দাদা যে প্রকরণে সায় জন্মাত সেও সেইভাবে সার রক্ষা করে। দাদাও যত্ন ক'রে কখনও সার করেনি সেও তা করে না। গোয়াল হতে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে গোবর ছড়িয়ে ফেলে। প্রায়ই চাষার বাসঘরের পাশে কোন গর্ত্তের মধ্যে এই গোবর জম্‌তে থাকে। নানারূপে ঐ গোবর নষ্ট হ'য়ে যায়। নানা অযত্নে ও অত্যাচারে সে গোবর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে, রৌদ্রতাপে শুকিয়ে যায়। তা হ'তে দুই ফল হয়। প্রথম ফল এই যে গোবরের যে সারটুকু জমির বীজ ধারণের শক্তিকে প্রখর ক'রতে পারে ততটুকু নষ্ট হ'য়ে বাতাসে রৌদ্রে মিশে যায় এবং বর্ষার সময়ে ভেসে নদী খাল দিয়ে বেরিয়ে যায়। চাষা এই নিঃসার শুষ্ক গোবর সার বলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করবার জন্য কষ্ট ক'রে জমিতে দেয়। চাষা অজ্ঞ। সার দেওয়া আবশ্যক ; সেটুকু সে বুঝে কিন্তু ঐ অবস্থায় গোবর রাখলে যে সমস্ত সার নষ্ট হ'য়ে যায়, তার ফলপ্রসবিনী শক্তি অনেক হ্রাস হ'য়ে যায়, সে তা বুঝে না; এবং এই গোবর ছাড়া দেশে পচা বাঁশপাতা কলার বাসনার ছাই প্রভৃতি সার তৈরী করায় যে নানাবিধ মশলা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে সে

অজ্ঞ। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ শতাধিক বৎসরের মধ্যে এখনও তাকে সে জ্ঞান দিতে পারে নি। কৃষি বিভাগে বড় বড় কর্ম্মচারী শহরে শহরে ঘুরেই বড় বড় মোটা বেতন নিয়ে দিব্যি মজা করেন কিন্তু সার তৈরীর জন্য কি কি দ্রব্য পল্লীগ্রামে প্রচুর পরিমাণ চাষার হাতের মধ্যে আছে সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কেহই অনুসন্ধান করেন নাই। মূর্খ চাষাকে আর বলব কি? সে বুঝেনা ব'লে প্রথার দাস হ'য়ে কাজ ক'রে মনের ইচ্ছাকে শান্ত করছে।

এই ত গেল প্রথম ফল যে অযত্ন-রক্ষিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গোবরের সার জমির ক্ষুধা মিটিয়ে তার বৎসরের ক্ষয়কে পূরণ করতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ চাষার বাসগৃহের পার্শ্বে ঐ গোবর প্রভৃতি আবর্জ্জনা নানারূপ রোগের বীজাণুর জন্ম ভূমি হয়ে বসে, তাতে চাষার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই উভয় ফলই চাষার সর্ব্বশক্তিকে নিষ্পেষণ করে দিচ্ছে। জমি খেতে পাচ্ছে না, চাষা রোগে ভুগ্‌ছে। এ কুফলের হাত হতে সে নিষ্কৃতি পাবে না, যতদিন সে না বুঝবে, কি ক'রে রাখলে গোবর সারময় হবে অথচ অস্বাস্থ্যের কারণ হবে না। ঘরের বহুদূরে যত্ন ক'রে এমনি ভাবে গোবর ও নানা আবর্জ্জনা রাখতে হবে যাতে ক'রে তার মধ্যে হ'তে রৌদ্র বাতাস ও বৃষ্টিতে আসল আবশ্যকীয় সারটী নষ্ট না ক'রে দিতে পারে। আর গোবর ছাড়া পল্লী প্রকৃতির অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যে সার আছে তা কিরূপে সংগ্রহ করা যায় অতি সহজে ও অল্পব্যয়ে সেটা কৃষি বিভাগের পণ্ডিত মহাশয়দের উপর দিতে হবে চাষাদের ঘরে ঘরে শিখিয়ে দেবার জন্য। সার দেওয়ার বেলায় চাষা সেই প্রাচীন প্রথানুসারে চলছে, জমি চষবার সময়ও সে সেই আবহমান কাল হ'তে যেব্যবস্থা চ'লে আস্‌ছে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না। তার একটু মৌলিকতার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দাদা যে নিয়মে জমি চষেছে, যে প্রকরণে সার

ছড়িয়ে বীজ বুনেছে সেও ঠিক সেই সেই নিয়ম প্রকরণের বিরুদ্ধে যায়না। সময়ের সুব্যবহারও জানে না, কাজের প্রণালীও বুঝে না। শৃঙ্খলা ত নাই-ই। কোন্ সময় কাজ করলে বেশী কাজ করা যায়, কি প্রণালী অবলম্বন করলে কাজটা অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ে, স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তার নাই। সকল কাজেই তার ঐ প্রথা একমাত্র উপায়।

জমি উর্ব্বরাশক্তি শূন্য হ'য়ে উঠেছে ব'লে চাষা যেমন দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে তেমনি পুরাতন একঘেয়ে অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করতে গিয়ে সে কোন উন্নতিই চোকে দেখতে পাচ্ছে না। পেটে খেতে পাচ্ছে না তাতে একদিকে তার শরীর ধ্বংসমুখে চলেছে অন্য দিকে ঋণের চাপে অহর্নিশ নিরন্তর দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছে—তার মন শুকিয়ে ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। এই রোগগ্রস্ত মন ও শরীর আবার পুত্রকন্যাতে প্রবেশ করছে! পুত্রকন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার পর মুহূর্ত্ত হ'তে বিবিধ রোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অকালে পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই হ'ল আমাদের চাষার জীবন যাত্রার সাধারণ গতি।

কয়েকবিঘা জমি ও পিতার লাঙ্গল ছাড়া চাষার পৈত্রিক সম্পত্তি আর কিছু হ'তে পারে না। দিন রাত মাঠে খেটে পেটের ভাত ছাড়া আর বড় কিছু সংগ্রহ করতে পারে না। তার আর কোন শিল্প বা বাণিজ্য কিছু করবারই অবসর হ'চ্ছে না। একদিকে সারের অপ্রাচুর্য্য ও জমির ক্রমসার শূন্যতা, অন্যদিকে চাষার অশিক্ষিত দুর্ব্বল অনশনক্লিষ্ট, অমার্জ্জিত মস্তিষ্ক ও চিন্তাক্ষুব্ধ মন এই উভয়ের যুদ্ধই চাষার জীবন। উভয়ই অধোগামী। উভয়েরই শক্তি নষ্ট হচ্ছে—কে এই শক্তি উদ্ধার করে? এই যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে কে? এই যুদ্ধের অবসান কবে হবে?

শিক্ষিত সমাজের ওপর এই প্রশ্ন সমাধানের ভার পড়েছে। চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে জ্ঞানেগুণে বিভূষিত হ'য়ে ওই প্রশ্নের উত্তর করতে যে দিন বস্‌বে সেই দিন চাষার সৌভাগ্য ফিরবে। চাষার ছেলে লেখা পড়া শিখে চাকুরী ক'রে চাষের কথা প্রাণপণ ভুলবার চেষ্টা করেছে। সে পাছে চাষা নামে খ্যাত হয়ে পড়ে—পাছে সে "চাষার ছেলে" ব'লে ভদ্র বাবু ভদ্র মিয়া মজলিশে ঠাঁই না পায়—পাছে তার লেখাপড়া শুধু 'চাষার ছেলে' হয়েছে ব'লে কোন আদরই সভ্যসমাজে না পায়—এই ভয়ে সে হয় বাপের নাম করতে চায় না, তার পরিচয়টা পর্য্যন্ত দিতে সাহস করে না আর না হয় তার পিতার নাম রূপান্তরিত ক'রে তার ব্যবসায় অন্য কিছু ব'লে নিজের মর্য্যাদা মানকে বাড়িয়ে তুলে। এইরূপে চাষার সংখ্যাও ক্রমে ক'মে যাচ্ছে—তাতে ক'রে শহরে ৩০৲ টাকার একটা চাকরী খালি হ'লে দুহাজার তিন হাজার শিক্ষিত যুবক দাঁড় হ'য়ে, সাহেব সুভা, নবাব সার হ'তে উঁচু দরের কেরাণী বাবুকে পর্য্যন্ত অস্থির ক'রে তুলেন। তাদের প্রাণ আই ঢাই ক'রে ওঠে। কত লাঞ্ছনাই না এই যুবকের দল খেয়ে ফিরছে। তবু তাদের ঘোর কাট্‌ছে না। চাষার ছেলে এই চাকরীকে অমৃত মনে করে যেমন কলমের সঙ্গে আফিসের চেয়ারের পায়ে বাঁধা পড়ছে তেমনি তার পিতা পিতামহ চাষ করতে গিয়ে বাবু মহাশয়দের দুয়ারে আটক হ'য়ে যাচ্ছে।

চাষের উৎপন্ন বৃদ্ধি করবার মত ও হ্রাসনীতিকে দমন করবার জন্য কোন জ্ঞানই তার নাই। সেই প্রাচীন প্রথাই তাকে যা দুমুঠা জোগাইতেছে। তার বাপ পিতামহের যুগে জমির উৎপাদিকাশক্তি (productive power) ও বীজধারণের উপকরণ (properties of the soil) অনেক বেশী ও অনেক তীক্ষ্ণ ছিল ব'লেই তারা যথেষ্ট সৌভাগ্যের মালিক হতে পেরেছিল। তার

ধান চ'াল সেই জন্য অত সস্তা দেখতে পেয়েছিল। তারা অতি অল্প আয়াসেই অতি অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর উৎপন্নের মুখ দেখতে পেত—সে জন্য তারা অনেক অবসরও পেত। অবসর ছিল ব'লেই তারা চাষবাসের সঙ্গে অন্য আর একটা ব্যবসায় ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্ করতে পারত; সুতরাং সহজেই সৌভাগ্যশালী হ'য়ে উঠত। গ্রামে যাঁরা ফিরেছেন তাঁরা দেখেছেন ও শুনেছেন সে কালে লোকে চাকরী না ক'রেও শুধু জমি খুঁড়েই কত বড় বড় বাড়ী ক'রে গিয়েছে—তার ভগ্নাবশেষ এখনও সেই যুগের অফুরন্ত সম্পদ্ ও কল্যাণের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই বন-জঙ্গলে ঘেরা ভূমিসাৎ সৌভাগ্যের ছবি দেখলে অতীতের কত কথাই না মনে উঠে। তখন মাটির নবশক্তি 'সোণার বাংলা' নামের প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিল।

সে শক্তিও কমেছে আর এখন সোণার বাংলা 'শনির বাংলায়' পরিণত হয়েছে। এই শনিকে দূরীভূত না করলে বাংলা ছারেখারে যাবে। চাষার জ্ঞান বুদ্ধি নাই, সে শনিগ্রস্ত হ'য়ে সেই দুর্ব্বল মাটির বুকে সারাদিন সারা সাঁঝ ব'সে ফসল তুলছে কিন্তু তার পেট ভরছে না। এই শনি তাড়াতে হ'লে জ্ঞানের অস্ত্র চাই। মাটিকে আবার শক্তি সম্পন্না ক'রে তুল্‌তে হবে। নূতন সার, নূতন চাষের যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে চাষার অবসর এনে দিতে হবে। চাষাকে গৃহীও করতে হবে—তাকে অবসরের শিল্পী করতে হবে এবং অবকাশের বণিক্ ক'রে তুলতে হবে—তার ছেলেকে কলমপাশ শেখা বন্ধ করে দিয়ে হালপাশ কৃষিপাশ শেখাতে হবে—তাকে তার বৃদ্ধ পিতার হাতের কাজে জীবন আরম্ভ করতে হবে, তবে চাষার আঁধার ঘর আলোকে ভরে উঠবে—তাই ত চাই—নয়ত আর তার পরিত্রাণ নাই!

চাষার ঋণ ও কোঅপারেটিব ক্রেডিট্

ঋণের দায়ে চাষা ভেঙ্গে পড়ছে। অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়ে দিয়ে চাষা ঋণ কিছুতেই পরিশোধ ক'রে উঠতে পারে না। ১৲ টাকা ধার করে একজন চাষা সারা জীবন মহাজনের ঘরে উসুল ক'রে শোধ করতে পারেনি—তার ছেলে সেই জের টানতে শুরু করেছে। বাংলার পল্লী সমাজে এই চাষার ঋণ একটা দানবের খেলা বলে বোধ হয়। মহাজনের আসন পল্লী সমাজের মাথায় তোলা আছে। মহাজন টাকা না দিলে চাষার মরতে চব্বিশ ঘণ্টাও লাগে না। সে মহাজনের গোলা হ'তে ধান আন্‌ছে খাচ্ছে আর চষে খুঁড়ে যা পাচ্ছে তা পিঠে ক'রে নিয়ে মহাজনের গোলা ভরছে। এইরূপে চাষার দুনিয়াটী সত্য সত্য ঘুরছে। বৎসরে এক একবার ঘুরে এসে অমনি মহাজনের প্রাঙ্গণে তার এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে। চাষা মহাজনের বাড়ী হ'তে যাত্রা আরম্ভ করে আর মাঠ ঘুরে এসে মহাজনের গোলার মুখে 'তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি' নিমেষে দূর করে। চাষার সঙ্গে এই মহাজনের এমনি সম্বন্ধ হ'য়েছে যে, কেহই কাহাকেও ছাড়তে পারছে না। চাষা ক্রমেই মহাজনের বাড়ীতে ব'সে যাচ্ছে। মহাজনও সুযোগ বুঝে তার স্কন্ধে চেপে বস্‌ছে খুব ভাল ক'রে। চাষা ফিরে বাড়ী যেতে পারছে না। এখন চাষাকে বাড়ী নিতে হ'লে, তার মাঠের ধান নিজের গোলায় উঠাতে হ'বে, মহাজনের গোলার খুঁটি হ'তে তার পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করতে হবে। সে যে নানা উপায়ে সেখানে বাধা পড়েছে। তার জমি ক্ষেতগুলিও মহাজনের বাক্সের মধ্যে আটকান। সে গুলিও বের করে দিতে হবে। মহাজনের সঙ্গে চাষার কোন সম্পর্কই যাতে ক'রে না থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এ যে 'করতে হবে, অনেক দিন পূর্ব্বে বুঝে কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের জারি করলেন। অমনি হাজার হাজার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'য়ে গেল। দেশে দেশে সোসাইটী গঠিত হ'ল। বাংলাদেশে শ্রমন শত শত সোসাইটী হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষার ঋণ কমিয়ে দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করা—তাকে মহাজনের গ্রীবা (কবল) হ'তে নিষ্কৃতি ক'রে দেওয়া। আজ প্রায় একুশ বৎসর হ'তে এই অনুষ্ঠান বাংলা দেশের জেলা মহকুমায় বৎসর বৎসর সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে চাষাকে টাকা দেওয়ার জন্য। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সেক্রেটারী বড় বড় শিক্ষিত উকিল মোক্তার ইত্যাদি। তাঁরা চাষাকে ঋণ মুক্ত করবার জন্য ব্যবস্থা করতে লেগেছেন। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট কাকে বলে সে সম্বন্ধে আমি বলব না। তবে এই চাষার 'ঋণগ্রস্ত হওয়া'রোগটাকে সারবার জন্য অল্প সুদে ঋণের যে ব্যবস্থা খোলা হয়েছে তাতে চাষার রোগ সারছে কি বাড়ছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করতে চাই।

পল্লী মহাজন যে চাইত তাকেই টাকা দিত, তবে সুদের হার বেশী। আর ক্রেডিট ওয়ালারাও টাকা দিচ্ছে তবে তাদের সুদের হার খুব কম। প্রভেদ শুধু সুদের অল্প হারেই দেখা যাচ্ছে তা নয় আর একটু বৈসাদৃশ্য আছে। মহাজনের নিকট একজন দুইজন দশজন ব'লে কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই—সে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন টাকা দেয়। কিন্তু ক্রেডিট্ দাতৃগণ'গাতা' ক'রে অর্থাৎ দশ বিশজন একসঙ্গে না গেলে টাকা ছাড়েন না। গ্রামের মাতব্বর যাঁরা তাঁরাই জামিন হয়ে সোসাইটী গঠন ক'রে টাকা বিতরণ করেন। পূর্ব্বে যে ঋণ করত না বা ঋণের ভয় করত ও মহাজনের নাম শুনে আতঙ্কে কাঁপত, অল্পসুদের লোভে সেও নির্ভয়ে ধীরে ধীরে সোসাইটীর খাতায় নাম লেখাচ্ছে। টাকা আদায়ে

করতে ডিরেক্টরদের কোন কষ্টই নাই। গ্রামের মাতব্বরগণ ঋণীদের কে কেমন অবস্থাপন্ন সমস্তই জানেন। তাঁরা অমনি তাদের গরু বাছুর ধান চাল আটক ক'রে টাকা আদায় করে লন। আবার ঋণীরা এসে নূতন বৎসরে নূতন ক'রে টাকা ধার করে। তাতে ক'রে ঋণ কম্‌ছে না বা প্রথম ঋণীরা ঋণমুক্ত হ'য়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেনা। তাদের স্বভাবও পরিবর্ত্তন হয় না। সুদের হার কম হওয়াতে তারা টাকা বেশী গ্রহণ করে; কিন্তু জমিতে জন্মায় পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী নয়, কাজেই তারা মহাজনের নিকট কম টাকা গ্রহণ ক'রে যে পরিমাণ সুদ দিত সোসাইটিতেও তারা সেই পরিমাণ সুদই দিচ্ছে কারণ টাকা বেশী এখানে। তা ছাড়া যারা মহাজনের কাছে ঘেঁসত না, তারাও সোসাইটীতে এসে ঋণী হয়ে বসেছে শুধু অল্প হারের লোভে। চাষাদের অভাব সকলেরই। তবে টাকা পাওয়া কঠিন হ'লে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করেই কাটাতে হয়; কিন্তু টাকা পাওয়া সহজ হ'লে সে কষ্টটুকু আর করতে হয় না। অতএব দেখতে পাওয়া যায়, ক্রেডিট সোসাইটি ঋণ কমাচ্ছে না বরং ঋণীর সংখ্যা অনুপাতে বেশী করছে। সোসাইটী আরও বৈজ্ঞানিক উপায়ে টাকার ব্যবসায় করতে বসেছে। পল্লী মহাজনের পরিবর্ত্তে আমরা শহুরে বৈজ্ঞানিক মহাজন পেয়েছি। তাতে চাষারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঋণগ্রস্ত হ'তে শিখ্‌ছে।

কিন্তু আমরা ত তা চাই না, চাষাকে ঋণী হ'তে আমরা দিব না। সে নিজে উপায় ক'রে আয় উৎপন্ন ক'রে স্বচ্ছন্দ সচ্ছল সম্পদশালী হোক্ এই আমরা চাই। সুদ কমিয়ে তাকে ঋণ করতে অভ্যস্ত করালে সে ত ঋণের হাত হ'তে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। সে ঋণই ক'রে চল্‌বে। সে ঋণ ছাড়াতে হয় কিরূপে তা ত শিখতে পারছে না। ক্রেডিট সোসাইটীর পরিদর্শকবর্গ অনেক সময় সত্য ন্যায় ধর্ম্মের মস্তকে

পদাঘাত করতে ইতস্ততঃ করেন না ; কাজেই তাঁরা চাষার কর্ত্তব্যগুলিও দেখিয়ে দিতে চান না অতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে। সবাই শোষণ করবেন তবে আর পূরণ করবে কে ?

কৃষকের দুর্দ্দশা

চাষার দুর্গতির কথা যখন মনে পড়ে তখন ওপারের কলের কৃতিত্বের কাতরানি ও গোঙানি চোখের সামনে ভেসে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে কল যে সম্পদ ও কল্যাণ জগতের বুকে এনেছে তা দেখে বাহবা দিচ্ছে না এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁরা বড় বড় শহরের বড় বড় অট্টালিকা, কলের হাওয়া, কলের আলো দেখে মুখে বলেন, বাহবা ! পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কি সভ্যতাই না সৃজন করেছে।' এতে তাঁরা মেতে উঠে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশটাকেও সেই দিকে অগ্রসর করাবার জন্য কত না প্রয়াস পান! "এই দেশ কলে ছেয়ে যাবে। সকল পল্লী শহর হয়ে উঠবে। মানুষ কত সুখের সামগ্রী ঘরে বসে পাবে—এই হল তাঁদের স্বপ্ন। কিন্তু আমি যখন ঐ কথা ভাবি তখন আমার প্রাণ আঁতকে ওঠে। ভবিষ্যৎ মানুষের বিনাশ সাধনই এই কল বৃদ্ধির অন্যতম ফল। মানুষের পরিধেয় ও বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য কলের প্রবর্ত্তন আবশ্যক। এই আবশ্যকতাকে মান্‌তে রাজি আছি যদি এতে ক'রে মানুষের আত্মা ও অন্ত মানুষটী কলের মুখে ব্যয় হয়ে না যায়। কিন্তু তা সম্ভবপর নয়। কলও বাড়বে মানুষেরও দরকার হবে। কল এসে মানুষের শ্রম কমায়নি বরং বাড়িয়েছে। ওঁরা বলেন কল হচ্ছে মানুষের শ্রম লাঘব করবার

জন্ত। কিন্তু কার্য্যতঃ শ্রম কমেনি। মানুষের শ্রম বেড়েই চলেছে। এই শ্রম বেড়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে তার সকল স্ফূর্ত্তি সকল স্বাধীনতা কলের পাকে নিহত হয়েছে। সে কলে ঢুকবার আগে নিজে খাটত ও পল্লীর নগ্ন-উদার প্রকৃতির কোলে অবসরের আনন্দে খাটুনির ক্ষুদ্র সাফল্যকে উপভোগ করতে পারত। আজ তার মাথার উপর কলের কাল ছাউনি, পাশে কলের কলবর ও কল-নিযুক্ত মানুষের অশান্ত কোলাহল তাকে মুহুর্মুহুঃ অবসন্ন করে ফেলছে। প্রতিদিনই সে একটুখানি ক'রে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করেই বলি।

বর্ত্তমান শিল্পপ্রসূত সভ্যতার (Industrial civilisation) গোড়া কোথায়? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইংলণ্ডে এই সভ্যতার উৎস। ক্রমশঃ সমস্ত জগৎ এই সভ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ঐ সভ্যতার প্রধান কারণ হ'ল ধন-সম্পদ বর্দ্ধন শক্তির অপরিসীম আতিশয্য। বাষ্প ও তড়িৎ; উৎপাদনের প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও শ্রমলাঘবকারী কল; অধিকতর শ্রমবিভাগ ও বহুল-উৎপাদন-প্রকরণ এবং সুদূর দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও শিল্পজ পদার্থের বিক্রয়ের জন্য জলস্থলে নানাবিধ আশ্চর্য্য সুযোগ আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের শ্রম নিরতিশয় কার্য্যকরী হ'য়ে পড়েছে। এই সমস্ত কারণে বস্তুতঃ সকলেরই ধারণা হ'ল, "শ্রম বাস্তবিক লঘু হবে—শ্রমীর অবস্থা ফিরবে—এই প্রকাণ্ড ধন-বর্দ্ধন-শক্তি দারিদ্র্যকে অতীতের 'উপকথায়' পরিণত করবে। সৌরকিরণ-হাস্যও আবার মধুর হ'য়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরবে—চতুর্দ্দিক সম্পদের স্ফূর্ত্তি গর্ব্বিত হ'য়ে জীবনের অবকাশকে সরগরম করে তুলবে।" অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে কে এই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করতে পেরেছিল? পালতোলা জাহাজকে সরিয়ে

দিয়ে বাষ্পপোত দেশ বিদেশে ঘুরে ফিরছে -- বাষ্পশকট মানুষকে মুহূর্ত্তে দূর দূরান্তরে রেখে আসছে—কল মানুষের সামান্য ইশারায় কত কি সৃষ্টি ক'রে তার সহস্র ইচ্ছাকে পূর্ণ করছে যা নাকি শত শত মানুষ, শত শত জন্তু শত দিনেও সম্পন্ন করতে পারত না। ভীষণ সাগর তরঙ্গ, গিরিপর্ব্বত, নদনদী উল্লঙ্ঘন করে কত অসমসাহসিক কার্য্য কলের সাহায্যে ঘটবে তা কে ভেবেছিল ? এই কল এসে দরিদ্রতম শ্রমীকে ছুটী দিয়েছে। সে অবকাশের আনন্দ সুখে উপভোগ করছে। মানুষ অভাবকে আর চোখে দেখ্‌ছে না। শান্তি ও নির্ভাবনা সকল দিক নিবিড় ক'রে ভ'রেছে। এই হ'ল কলভক্তদের রায়।

এঁরা বলেন,—এই সম্পদের মধ্যে মানসিক সম্পদ ও নৈতিক কল্যাণ জেগে উঠ্‌বে। সোণার যুগ আবার ফিরবে। সকলেই অবকাশ উপভোগ করবে। মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। মানুষ আর বুভুক্ষু থাকবে না, খর্ব্ব হবে না; লোভ আর মানুষকে পাপাসক্ত করতে পারবে না। সকলেই অভাবের ওপরে উঠ্‌বে। শিশু শার্দ্দুলের সঙ্গে খেলা করবে। আস্‌মানের নক্ষত্র ও শশীর কিরণসুধা পানে বিভোর হ'য়ে মানুষ নশ্বর পৃথিবীকে দেবগণের শাশ্বতভবনে পরিণত কর্‌বে। যত আবিলতা দূরে সরে যাবে; নিষ্ঠুর কঠোরতা কোমল হ'য়ে উঠ্‌বে এবং সকল অশান্তি মনোরম শান্তি ও মনোহারিত্বে ফুটে সুরভি সঞ্চার করবে। তা হলে দারিদ্র্যসম্ভূত পাপ, অজ্ঞতা, পাশবিকতা ও নৈতিক দুর্ব্বলতা কি ক'রে তিষ্ঠতে পারবে ? দারিদ্র্য লোপ পাবে ও দারিদ্র্যের ভয় আর থাক্‌বে না। কে তাহ'লে অধীন থাক্‌বে ? কে তাহ'লে উৎপীড়িত হবে ? সকলেই সেখানে স্বাধীন ও সকলেই সেখানে ধনসম্পদশালী রাজাধিরাজ হ'য়ে দাঁড়াবে।

কলের মরীচিকা এই স্বপ্নে সমাজের স্তরে স্তরে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আলাউদ্দীনের প্রদীপের মত কত না আশ্চর্য্য

আবিষ্কারে এই আধুনিক যুগ অতীতকে ডিঙিয়ে জলজীবন্ত মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠেছে। আর ঐ আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি অভিনব প্রক্রিয়া এসে অর্থকে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করে ঐ স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলবার আয়োজন করেছে। এই স্বপ্নজাত দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষা প্রত্যেককে এরূপ ভাবে অভিভূত করেছে যে, সমাজগতি দিক্ পরিবর্ত্তন ক'রে বিভিন্ন চিন্তাধারায় ও বিভিন্ন নীতিতে মানুষকে দীক্ষিত ক'রে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন সকল জ্ঞানশাখাতে বিস্ময়কর বিপ্লব এনেছে। প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারা, সংস্কার ও জীবনের উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মকর্ত্তব্য সমস্তই বিকৃত হয়ে গেছে। সমস্তই ওলট পালট হ'য়ে গেছে। মানুষ নিরন্তর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও নিদারুণ ব্যস্ততাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলেছে। এই অবিরাম কার্য্যকঠোরতা আজ সভ্যতার মাপকাটি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ কে ওঁরা বলেন কাজ (Business)। যে এই উদ্বিগ্ন কর্ম্মকাঠিন্যকে ঘৃণা ক'রে নিবিড় নিরিবিলি জীবন শিশিরসিক্ত সমীরণের মধ্যে খেলিয়ে রাখ্‌তে চায় সে অকেজো—এটা একটা গালি আজকের দিনে। প্রাণের বহু বিকাশ ও হৃদয়ের উন্মীলন, সমাজে ও ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারে প্রকটিত হ'তে আজ আর পারে না। সকলই গৃহ-পল্লীর শান্তনিবিড় জীবনকে অপসন্দ ক'রে শহরের ভাড়াটে সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করা খুবই আনন্দ-জনক মনে করছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দিন দিন বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কার লাভ ঘটছে। স্বপ্ন ও দুরাশা যে কি অঘটন ঘটিয়ে তুলেছে তাই আজকার দিনে দানবের আকৃতি ধ'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। সে ক্রমেই আস্‌মান ধরতে চাচ্ছে। সে ভুল থাক্‌বার নয়। স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে। অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ উঠেছে বেশী। কল এসেছিল সুখ ঘটাতে কিন্তু সে যে কি দিয়েছে তার অভিযোগ আজ

পথিবীর সর্ব্বত্র মর্ম্মান্তিক ও নিদারুণ নিনাদে নির্ঘোষিত হচ্ছে। কলের গর্ব্ব খান খান হ'য়ে শ্রমীর সঙ্ঘকে বিপুল ক'রে তুলেছে।

শ্রমীর করুণ অভিযোগ বিশ্বপ্রভু খোদার আসন টলিয়ে দেওয়ার যোগাড় করেছে, সে ইতিহাস এখানে বলার দরকার নাই। আজ সকলেই "নিদারুণ সময়ে" (hard times) এসে পৌছেচে। যেখানে মানুষ গণতন্ত্রের আওতায় স্বাধীনতা পেয়েছে, আবার সেখানে মানুষ রাষ্ট্রতন্ত্রের শতজালে জড়িত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম করেছে। যেখানে ব্যবসায় সচল, সেখানে বিপুলবাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব'সেছে। সে দেশে মাত্র কাগজ অর্থের জ্ঞাপক হ'য়ে ফিরছে। যেদেশে স্বর্ণ রৌপ্যের ছড়াছড়ি সে দেশেও ঐ "নিদারুণ সময়ের" হাহাকার নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর ভিতর একটি সাধারণ হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। দেশকাল পাত্র ভেদে কলের প্রভাব বিভিন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তবু কতকগুলি কারণ সর্ব্বত্র এক এবং তার ফলও এক। এই কলের প্রধান কীর্ত্তি হচ্ছে পার্থিব সম্পদের প্রভূত বৃদ্ধি (material progress), যাকে "সংসারের উন্নতি" বলা যেতে পারে। ঐ উন্নতির জন্য কতকগুলি কারণ একত্র মিলিত হওয়া আবশ্যক। যেখানে যে শহরে নগরে এই কারণ সমূহ সম্পূর্ণ সমাবিষ্ট হয়েছে সেখানে তত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ঐ উন্নতির বুক চিরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে রক্তনদী প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে তা আর কেহ লক্ষ্য করছে না। তাই দেখা যায় যেখানে লোক সংখ্যা খুব বেশী, ধনসম্পদ প্রচুর, উৎপাদনের কল ও বণ্টনক্রিয়া (Exchange, Distribution) পূর্ণরূপে স্ফুর্ত্তিলাভ ক'রেছে সেখানেই গভীরতম দারিদ্র্য, জীবন যাত্রার কঠোরতম প্রয়াস, এবং নিরুপায় অলসতা কর্ম্মাভাবকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। মানুষ পেটের জ্বালায়

করতে করতে অনিবার্য্য মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লাভ করছে। ধনী ধনের গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে যেমন তেমনি অবিচলিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ছে। পল্লীর বুক শূন্য হয়েছে শহরের এক ইঞ্চিও শূন্য নাই। ভিক্ষুকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে। যেখানে কল এখনও শিশুর মত দুর্ব্বল ও স্ফূর্ত্তিলাভ করতে পারেনি সেখানে এখনও দারিদ্র্য ও কর্ম্মহীন আলস্য পুরা বৃদ্ধিলাভ করেনি! কিন্তু কলের চরম স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অফুরন্ত প্রাচুর্য্যের মধ্যে হৃদয়বিদারক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। কল যেখানে এখনও ধনীর ঘরে প্রচুর আরাম ও বিলাসকে এনে দিতে পারেনি সেখানে তাকে কাজ করতে হয় ও সাধারণ মানুষও খাঁটে সুতরাং সেখানে দরিদ্র ও ভিক্ষুকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। শহরে ভিক্ষুক, রোগী ও দুরবস্থাপন্ন অসহায় নারী পুরুষ বালক বালিকার সংখ্যা যত বেশী, পল্লীতে তত নয়। কলের উপর কল বেড়ে গিয়ে শ্রম কমাবার ছল ক'রে যতই উন্নতি ক'রে যাচ্ছে ততই দারিদ্র্য ভীষণ মূর্ত্তি ধরছে। সমাজের মুষ্টিমেয় একশ্রেণী অনিন্দ্য সুখে কাল যাপন কর্‌ছে আর অধিকাংশ এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করতে প্রাণপাত ক'রে দিচ্ছে। এই সত্য ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হচ্ছে। কল যে গতি ধ'রেছে তাতে ধনেরই বৃদ্ধি হচ্ছে বটে কিন্তু দারিদ্র্য কম্‌ছে না এবং কম্‌বে এমন আশা করা যায় না। শ্রমীর শ্রম লঘু হচ্ছে না বরং শ্রমীর ভার ক্রমশঃ গুরু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ধনী নির্ধন এর মধ্যে পার্থক্যের রেখা ক্রমশঃ বৃহত্তর হয়ে উঠ্‌ছে। কলের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কারখানার (factory) পর কারখানা ক'রে পৃথিবীর খোলা বাতাস ও মুক্ত আকাশকে ঢেকে ফেলা আর রাশি রাশি ধনে ধনীর গৃহপ্রাঙ্গন ভ'রে দেওয়া। কিন্তু তারই মাঝে মানুষ ক্ষুধায় প্রাণ হারাচ্ছে। ক্ষুদ্র শিশু কর্ম্মরত জননীর শুষ্ক বুক টেনে নিসাড় হ'য়ে থাক্‌ছে আর চতুর্দ্দিক অর্থগৃধ্নুতা ও ধনপূজা তাণ্ডব নৃত্য করে অভাবের নিষ্ঠুরতার হাত হ'তে পরিত্রাণ-তৃষ্ণা আরও প্রখর ক'রে তুল্‌ছে।

সত্য বল্‌তে, ধন বর্দ্ধিত হয়েছে বিষম। কল শান্তি অবসর ও পরিচ্ছন্নতাও এনেছে কিন্তু অনেকের পক্ষে উহার বিন্দুপরিমাণও জুঠে ওঠেনি। যারা সমাজের তলে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ যারা সমাজের নিম্নস্তরে প'ড়ে উচ্চস্তরের চাপে প্রাণ হা'রাতে ব'সেছে তারা ঐ সুখ শান্তির কণা পরিমাণও চোখে দেখ্‌তে পায় না। কল ঐ উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে যে দাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে তা আর মুছ্‌তে চায় না। নীচে যারা পড়েছে তারা ধ্বংসের মুখে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সমাজ অনুদ্বেগের ঔদাসীন্যে উপরের স্তরকে বাহবা দিচ্ছে।

দারিদ্র্য ও ধনোন্নতি (Poverty and progress) আজকার জগতে কল-সভ্যতার দুইটী যমজ সন্তান। এদের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রভাব অতীব ভীষণরূপে দেখা দিয়েছে! এই সভ্যতা কেন্দ্র ক'রে বর্ত্তমান যুগের সকল চিন্তা—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—ভবিষ্যতের সমস্যা মীমাংসা করতে ব'সে গেছে। কল যতই বাড়বে ততই তার যমজ সন্তানের মধ্যে বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হবে। উভয়ই বিপরীত মুখে চল্‌ছে। একে অপরকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছে এ দ্বন্দ্ব কবে থামবে তা খোদাই জানেন। একটা অভাবকে প্রবল ক'রে তুল্‌বে—আর একটা কয়েক জনের ক্ষুধা নিবৃত্তি ত করবেই তা ছাড়া তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে থাকবে; অবশেষে প্রতিঘাত শুরু হবেই। দ্বিতল ত্রিতল যতই বাড়ছে ততই সমাজ শেষ প্রলয়ের ও ভয়ঙ্কর বিপ্লবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

পূর্ব্বকালে সকলকে কাজ করতে হ'ত। সকলেই স্বাধীন জীবন যাপন করত। ভিক্ষুকের শ্রেণী হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। ধনেরও প্রচুর বৃদ্ধি হ'ত না। সকলই স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকৃত। তারপর ক্রমশঃ গৃহশিল্পের উন্নতি হ'ল, পরিবার ক্রমে বেড়ে গেল। তখন লোক গৃহত্যাগ ক'রে আয়ের সন্ধানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। এই সময়ে মানুষের

আত্মস্বার্থ বিপুল হ'তে লাগল সুতরাং অক্ষমেরা গোটা সমাজের ওপর চেপে বস্‌ল। দারিদ্র্য ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু প্রবল বেগে এই দারিদ্র্য বাড়ে নি।

চাষার জীবন মাটির ওপর নির্ভর করছে। তার গৃহশিল্প পশ্চিমের কল বিনষ্ট ক'রে দিয়েছে। সব তার যোগাতে হচ্ছে ঐ মাটী খুঁড়ে খুড়ে। মাটি আর কত পারে? তার ত শক্তির একটা সীমা আছে। সে ত আর কল্পতরু কামধেনু নয় যে যত ইচ্ছা ততই তার নিকট পাওয়া যাবে। মাটির উর্ব্বরতা কমে গেছে। প্রতি বৎসরই মাটি খেটে খেটে চাষার হাতে দিচ্ছে কিন্তু প্রতি বৎসরই মাটি কিছু কম ক'রেই দিতে পারছে। চাষা কম পাচ্ছে, তার অভাব বেড়ে যাচ্ছে। মাটির ফল দিয়ে তার সকল অভাব পূরণ করতে হচ্ছে। সে যে ফল পায় তার আবার অংশীদার কত জন—সেটা দেখা আবশ্যক। একা চাষা খাট্‌ছে আর তার কাঁধে চেপে কতজন সে খাঁটুনির ফলটা উপভোগ কচ্ছে তা দেখ্‌লে বুঝা যাবে চাষার দুর্গতি উর্দ্ধগামী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কল তৈরী কচ্ছে আর কয়েকটী লোকে তার ফলে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখছে আর সাধারণে বুভুক্ষু জীবন ল'য়ে ব্যস্ত। এখানে চাষা তৈরী কচ্ছে আর সকলে এসে তার সব ভাগবাটরা ক'রে তিল তিল ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চাষা যেমন তেমনি শূন্য পেটে টোকা মাথায় নিড়ানি হাতে মাটির আতপতাপে দগ্ধ হচ্ছে।

চাষা যা জমি খুঁড়ে পেল তা সব জমিদার ও মহাজন ভাগ করে গ্রাস করল। চাষা একেবারে অন্নহীন বস্ত্রহীন হ'ল। এখনও চাষা মহাজনের আশ্রয় পেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগ্‌ল। এবার তার আর উপায় নাই। মহাজনের ঘরে যে দেনা জমেছে তার পরিমাণই ভয়ানক—তখন আর কে তাহাকে সাহায্য করবে? এইবার জমি ছেড়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বেঁধে

শহরমুখে ছুট্। পুত্রকন্যা পরিবার যে যেখানে পারে সেখানে অন্নের জ্বালায় বের হ'য়ে পড়ে। জমি ক্ষেত সব মহাজন জমিদারের ঘরে উঠে। পৈত্রিক ভিটা একেবারে বন জঙ্গলে ভরে যায়। এই জমিহীন অবস্থা চাষাকে কাঙ্গাল ক'রে ছাড়ছে। এ অবস্থা স্থানে স্থানে এসে গেছে। বহু লোক বাস্তুহীন হ'য়ে জমি ছেড়ে দেউলিয়া সেজে গ্রাম কি গ্রাম উজাড় ক'রে তুলছে।

আর উদাসীন হয়ে থাক্‌লে ভবিষ্যতে জাতীয় মহামৃত্যু অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌বে। জাতির জীবনী শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হবে। চাষার মৃত্যু অর্থে জাতির মৃত্যু একথা দিবালোকের মত সত্য। এম্ এ, বি এ, পাশ ক'র আমাদের চাষা হতে হবে—জমির নষ্ট শক্তিকে সঞ্জীবিত ও পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুল্‌তে হবে—চাষার অস্তিত্ব যাতে রক্ষা পায় তার চেষ্টা পেতে হবে। জমিদার ও মহাজন ব্যবসায়দারদের অংশ কমাতে হবে। মহাজনের লাভ ও ব্যবসায়দারদের মুনাফা চাষার হাতে দিতে হবে। মহাজন ও ব্যবসায়দারদের টাকা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকল্পে খাটাতে হবে। চাষার অজ্ঞতা, মুর্খতা ও অসহায়তার সুযোগ যাতে তারা না নিতে পারে তার যথাসাধ্য প্রয়াস করতে হবে। চাষাকে জ্ঞানী ও সংঘবদ্ধ ক'রে তার নিজের অধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তারা শ্রম ক'রে যাতে নির্ব্বোধ হ'য়ে নিঃসহায়ের মত না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির শক্তিকে ফিরাতে পারলে চাষার চাষের ব্যয়ও কমে যাবে।

চাষা মনে করে জমি যত চষা যাবে ততই ফসল উঠ্‌বে; জমি একেবারে অক্ষয়। একথা ভুল, তা তাকে প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে। নতুবা সে বিশ্বাস ক'রবে না। এর জন্য দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির দায়িত্ব বেশী। যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে দিয়েই দেশের সেবা ক'রে আস্‌ছেন; শুধু হয় সরকারকে না হয় আর কাউকে নিন্দা ক'রেই কর্ত্তব্য শেষ করছেন—তাঁদের প্রতি

আমার বল্‌বার কিছু নেই। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত হ'য়ে চাষার জীবন ঘৃণ্য মনে করেন অথচ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী জীবনকে ধন্য ধন্য ক'রে বরণ ক'রে নিচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার এই অনুরোধ। তাঁরা যদি আগ্রহ ক'রে এই চাষার জীবনকে বরণ করতে পারেন আর উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধীরে ধীরে উদ্ভাবন করতে প্রস্তুত হন আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি তাঁরা সহজে ধর্ম্ম ও অর্থে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবেন।

জমিদার ও সরকারের প্রাপ্য অনেক প্রকারের। জমির বার্ষিক খাজানা ত আছেই তার সঙ্গে আরও অনেক বেশী দিতে হয়।

যথা :—

(ক) পেয়াদার রোজ। খাজানার তাগাদার জন্য লোক (সাধারণতঃ পাইক) পাঠান হয় তার খোরাকী ও শ্রম বাবদ খরচ।

(খ) হিসাবানা। জমিদারের গোমস্তা বা নায়েবের নজর নির্দ্ধারিত খাজানার প্রতি টাকায় এক আনা হইতে ছয় আনা।

(গ) পথকর অর্থাৎ সেস নির্দ্ধারিত খাজানার প্রতি টাকায় তিন পয়সা হইতে তিন আনা।

(ঘ) কিস্তি খেলাপী সুদ। টাকায় দু পয়সা হইতে দুই আনা।

(ঙ) নজরানা। জমিদার কি ম্যানেজার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন প্রজাদের কল্যাণ কুড়িয়ে আন্‌তে মফঃস্বলে অভিযান করেন তখন প্রত্যেক প্রজাকে হুজুরে হাজির হ'য়ে এক টাকা হতে দশ পাঁচ টাকা সম্মানের চিহ্ন প্রদান করতে হয়।

(চ) এছাড়া মোকদ্দমা খরচ ত আছেই। প্রজা সময়মত খাজানা দিতে পারে না কাজেই কোর্টে মোকদ্দমা রুজু হ'য়ে যায়। এটা অন্যূন শতকরা ৬০ জনকে বহন করতে হয়।

(ছ) এবার সরকারের দাবী পূরণ করতে হয়। চৌকিদারী ট্যাক্‌স্‌ ত বাঁধা আছেই।

মহাজনের প্রাপ্য দুই প্রকারের। বলা হয়েছে চাষাকে টাকাও কর্জ্জ করতে হয় আর ধানও ঋণ করতে হয়। উভয়েরই জন্য তাকে বাড়তি বহন করতে হয়। মহাজন আসলের উপর সুদ ও ধান্যের উপর বাড়তি আদায় করে। আসল ত থাকেই। এই বাড়তি বৎসর বৎসর বেড়ে চলে। কাজেই আসলে আর হাত পড়ে না। সেটা মহাজনের চিরদিনকার আয়ের সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসায়দারদের রক্তশোষণ ক্রিয়া কম নয়। তারা অল্পমূল্যে চাষার ঘর থেকে তার কাঁচা ফসল ক্রয় ক'রে সহরের বড় ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় ক'রে মোটা লাভ করে। এ লাভটা বস্তুতঃ চাষারই প্রাপ্য কিন্তু চাষার দুর্ব্বুদ্ধির জন্য সে কিছুই পায় না। অনেক সময় ব্যয় যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক অল্পে বিক্রয় করতে হয়; কারণ মহাজন ও পাইকের তাগাদা তাকে অধমরা ক'রে তোলে। তাকে নিরুপায় হ'য়ে যা জুটে তাই নিয়েই নিজের রক্ত ব্যয় ক'রে তৈরী করা ফসলকে ঘর থেকে বের করতে হয়। এমনি ক'রেই চাষার দিন সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রভাত হ'য়ে যাচ্ছে। এই কঠোর নিঃসহায়তা হ'তে চাষাকে মুক্ত না করতে পার্‌লে জাতির মুক্তি অসম্ভব।

সকলেই ত বড় বড় অংশ অধিকার ক'রে বস্‌ল। চাষার ভাগে যে অংশটুকু পড়েছে তার আকার কত ক্ষীণ। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্য হতে তার নিজের শ্রম ও পরিবারের আহার ও পরিধেয় সংগ্রহ কর্‌তে হয়। এই সামান্য আয়ে তার সব কিছু কিন্‌তে হয়। আজকার দিনে সরকারের ট্যাক্‌স্‌ যতই বাড়ছে, চাষার নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য ততই মহার্ঘ হ'য়ে উঠছে। ওদিকে জমির ফসলও দিন দিন কমে যাচ্ছে। দুদিক

হ'তেই সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হচ্ছে। ঐ সামান্য উদ্বৃত্ত দিয়ে তাকে দুর্লভ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ কর্‌তে গিয়ে দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছতে হয়। এই উদ্বৃত্ত যত কম হয়ে যাবে ততই বর্ত্তমানের দুরাচার, পাপ, মিথ্যা ও সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য শত মুখে ব্যাপ্তি লাভ করবে। এই ক্ষুদ্র উদ্বৃত্তই আজকার সকল দুর্বৃত্তিরই মূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্বৃত্তকে বৃহতাকার করতে হবে। গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সরকারের ক্ষুধাবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আর এ ক্ষুধার শান্তি করতেই হবে নতুবা পাশবিক শক্তির খেলা ও উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌বে। কাজেই এই ক্ষুধাকে শান্ত করবার মত শক্তি পেতে হ'লে চাষাকে বলবান্ হ'তে হবে। তাকে পরিপুষ্ট হতে হবে কারণ সামাজিক সকল ভার তার স্কন্ধে চেপে বস্‌বে। তাকে ধনশালী ও বলশালী হ'তেই হবে তা না হলে গণতন্ত্র অচল হবে এবং অবশেষে ভেঙ্গে পড়বে! তখনই উভয় সঙ্কট—ভেঙ্গে পড়লেও পুরাতন অশান্তি দুর্জ্জয় হয়ে উঠবে আর টিকে থাক্‌লেও চাষা ভেঙ্গে পড়বে। সমাজের খেলা ঘর চুরমার হয়ে যাবে।

এস্থলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী কয়টি তাহা দেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রধানতঃ আমাদের দেশবাসীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে! কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধনী। কিন্তু ধনীর সংখ্যা এত কম যে এদেশবাসীকে সাধারণতঃ মোটামুটি কৃষক ও মধ্যবিত্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষক শ্রেণীর উপর চেপে বসেছে।

দেশের লোকদিগকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত করা যাক্—কৃষিজীবি সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত (middle class) সম্প্রদায়। যাকে আমি অকৃষকশ্রেণী বল্‌তে চাই, তারা চাষের কাজ করে না। কৃষকশ্রেণীই সংখ্যায় বেশী। চাষার সংখ্যা শতকরা ৭০ এরও বেশী। কৃষকদের মধ্যে

সকলেরই কিছু না কিছু দু এক কাঠা জমি ছিল ; কিন্তু আজ এমন কৃষক দেখা যাচ্ছে যার এক ছটাকও জমি নাই ; দিন আনা, দিন শ্রম করা, দিন উপার্জ্জন করাই, তার জীবনধারণের একমাত্র উপায় হয়েছে। আবার জমিহীনদের অনেককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই ভিক্ষাবৃত্তিকে এক সম্প্রদায় ব্যবসায় ও পরিবারের আয়ের উপায় করে নিয়েছে। এই ভিক্ষুক শ্রেণী প্রতি বৎসর সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে। জমি হতে বিতাড়িত হয়ে দায়গ্রস্ত চাষা হয় দৈনিক পরের ক্ষেতে খেটে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করছে—না হয় শহরে গিয়ে কলে ঢুকছে আর না হয় সহজ সরল ভিক্ষার রাস্তা ধরে সটান শহরের দ্বারে দ্বারে ফিরতে লেগে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের আর উপায় নাই। তার গৃহশিল্প লোপ পেয়েছে। সে অবসর সময়ে তার আচ্ছাদন নিজ হাতে তৈরী করত আজ তাকে পরের দুয়ারে তার জন্য হাত পেতে বেড়াতে হচ্ছে। এ অভিশাপ হতে কবে তার মুক্তি হবে কে জানে ? সামাজিক প্রথা এর ওপর নিদারুণ হয়ে ব্যাপারটী আরও সাংঘাতিক করে তুলেছে।

এদেশের প্রথা বাল্যকালে বিবাহ করতেই হবে। জমিহীন চাষা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে একেবারে পল্লী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে। পুত্রকন্যা আসছে, অকালে বিদায় নিচ্ছে কিন্তু এ দুঃখের মাঝেও এ অবিরাম আসা যাওয়ার শেষ হচ্ছে না। দুঃখ শতগুণ বেড়ে যাচ্ছে। অভাব চতুর্দ্দিকে হুঙ্কার ছাড়ছে ! ভীতচকিত হয়ে অবস্থাপন্ন পরিবার ও শহরবাসী দ্বাররুদ্ধ করে দিচ্ছে। কাঙ্গাল এবার পথের পরে মরে থাকছে। কে কারে দেখে ? শহরে এ দৃশ্য অতীব সচরাচর ঘটছে। সভ্যতা ও অর্থ শহরেই জমেছে ; সেই লোভে পল্লী ছেড়ে জমি ছেড়ে বিপন্ন চাষা শহরের অলি গলি চীৎকার করে ফিরছে। তার করুণ ক্রন্দন বড় বড় কোঠা ডিঙ্গিয়ে আকাশে বাতাসে মিশে যাচ্ছে কিন্তু শহরের

গৃহ প্রাঙ্গনে ঢুক্‌ছে না। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদের শ্রমশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই কিন্তু শ্রম কর্‌বে কোথায়? কাজ জুটীছে না। যারা অক্ষম তারা ত পথেই পড়ে রয়েছে। এখন দেখা গেল জমি যাদের নেই তারা হয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে আর না হয় পরের ক্ষেতে কি অন্যত্র পরিশ্রম করে জীবিকার সংস্থান করছে। জমি যাদের আছে তাদের মধ্যে কেহ বা অতি অনটনের মধ্যে জমির চাষ করে ফসল তুল্‌ছে—ঘুরিয়ে আন্‌তে ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর অবশিষ্ট সকলে একরূপ অভাবের উৎপীড়নকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু কেহই অভাবের উপরে উঠতে পারছে না।

তারপর অকৃষকশ্রেণীর কথা বলা যাক্। ইহাদিগকে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে সংক্ষেপে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজসেবা ও চাকুরী সবচেয়ে অধিকাংশের পেশা হয়েছে। শিল্পীদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হতে বসেছে। যে ভারতশিল্প এক সময় রোমের রাজ্ঞীকে বিমুগ্ধ করেছিল—যে শিল্প ভারতবাসীকে নানা আনন্দের সামগ্রীতে প্রফুল্ল করত—যে শিল্প ভারতনারীর নিত্যকার্য্যে ও অবসরে বিরাম এনে দিত—যে শিল্প ভারত সভ্যতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীরাষ্ট্র ও গৃহপরিবারকে শান্তনিবিড় প্রাচুর্য্যের মধ্যে পূর্ণ সার্থক করে তুলেছিল—সেই শিল্প আজ কলের হাওয়ায় বিমলিন বিশুষ্ক হয়ে গেছে। এখন তারই পরিবর্ত্তে কলের অপরিসীম তৃষ্ণা জীবনকে তীব্র ব্যস্ততায় ভর্‌তে বসেছে—একি ভয়ানক! ব্যবসায়দারদের মধ্যে সকলই ব্যবহার্য্য পদার্থের স্থান পরিবর্ত্তন করেই অর্থ সংগ্রহ করছেন। জমিদার ও মহাজনদের কথা বলে কাজ নাই। এখন দেখা হল যে, এই অকৃষকশ্রেণীর মধ্যে মুষ্টিমেয় শিল্পী ব্যতীত বাকী সকলই অনুৎপাদক। সকলই চাষার ঘাড়ের উপর চেপে বসে রয়েছে। চাকুরে গভর্ণমেণ্টের ঘর হ'তে আন্‌ছেন আর গভর্ণমেণ্টের আয় অধিকাংশ অবশেষে চাষার ক্ষেত হ'তে উঠে। জমিদার ও মহাজন চাষার সঙ্গে কারবার ক'রেই বড় মানু-

যের বাহাদুরী বজায় করেন। ব্যবসায়ী চাষার উৎপন্নকে কমমূল্যে ক্রয় করে চাষার লাভকে গ্রাস করে ; আবার বিদেশ হ'তে সামগ্রী এনে ঐ চাষার নিকটই অধিক মূল্যে বিক্রয় ক'রে তার রক্তে নিজে পুষ্ট হয়—এই করেই ব্যবসায়ী ধনাঢ্য হয়ে উঠ্‌ছে। তারা কৃপা ক'রেও বেচারা চাষাকে এতটুকু ছাড়তে চায় না।

এখন চাষার দারিদ্র্য কিরূপে দেশের অর্থাৎ গোটা ভারতের দারিদ্র্য ঘোষণা করে এই কথাই বলতে চাই। খাদ্য দ্রব্য হতে আরম্ভ করে কয়েকটী দফা বিচার করলেই প্রতিপন্ন হবে যে, চাষার দারিদ্র্য ভারতের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করছে। আর ভারত দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে।

প্রথম খাদ্য সামগ্রী ধরা যাক্ জমি খুঁড়ে চাষা খাদ্য দ্রব্যকে বের করছে, তার অধিকাংশ বেচে তাকে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পরিধেয় ইত্যাদি আন্‌তে হচ্ছে, কাজেই তার আহার কমে গেছে। আজকাল ভারতে প্রায় শতকরা ৬৪ জন লোক অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। খুব বেশী হয়ত মোটে শতকরা ৫ জন একটু পেট ভরে খেতে পায়। লোকসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জন্মের সংখ্যাও বেশী এবং মৃত্যুর সংখ্যাও বেশী, কিন্তু তাহলেও লোকসংখ্যা মোটের উপর বেশী হয়েছে। বিদেশ হ'তে এসে দিন দিন ভারতের মাটিতে বহু বিদেশী বাসা বাঁধছে। ভারতের আহার্য্য বিদেশীরাও অবলম্বন ক'রছে আবার এই কাঁচা উৎপন্নকে বিদেশে পাঠিয়ে ভারতের শাসনব্যয় ও বিদেশীর পণ্য আমদানীর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং লোক সংখ্যার পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে কম হয়ে গেছে। এর ওপর আবার জমির শক্তি কমে গেছে বলে জমি দিচ্ছেও কম। এই উভয় টানে চাষা মাঝখানে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারকেই অদৃষ্টের লেখা বলে ধরে নিয়েছে।

অর্থজ্ঞ ম্যালথাস বলেন মানুষের জননলিপ্সা চিরন্তন ও অতীব প্রবল—একে দমন করা সুকঠিন। আবার প্রকৃতিও অত্যন্ত কৃপণ। মানুষের

সংখ্যা বৃদ্ধি হবে কিন্তু তদনুপাতে প্রকৃতি আহার যোগাবে অনেক কম। এ অবস্থায় অনেক মানুষকেই অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকতে হবে পরাক্রান্ত যারা তারাই সিংহের অংশ ভোগ করবে আর দুর্ব্বলকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ফলে দুর্ব্বলেরা নিয়তির কবলে ধরা দেবে মৃত্যু, রোগ, জরা, দুর্গতি, দারিদ্র্য, দুরাচার ও পাপ ধীরে ধীরে দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করতে থাকবে। রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্ব্বল তাদের হাতে ধরা পড়বে। এই জননলিপ্সাকে যথাসম্ভব সংযত করতে হবে, লোকসংখ্যাকে আহার্য্যের অনুপাতে সমান ক'রে রাখতে হবে। আহার্য্যের আয়োজন না ক'রে কোন মানুষই যেন জননলিপ্সার পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যগ্র না হয়। সে যে ক'রেই হোক। সামাজিক প্রথাকে যদি তার জন্য উল্লঙ্ঘন কিংবা সংস্কার করতে হয় সেও করতে হবে। বেশী বয়সে বিবাহ করতে হবে, উপার্জ্জনের উপায় ক'রে। বাল্য বিবাহকে উড়িয়ে দিতে হবে এবং বিবাহকে অনিবার্য্য ক'রে তুল্‌তে হবে না। তাহলে সমাজ রোগ ও পাপ, দুরাচার ও দারিদ্র্যের হাত হতে মুক্তি লাভ করবে। সকলেই পেট ভরে খেতে পাবে। এই কথাটা কি আমাদের পক্ষে খাটে না? বিবাহ দিতেই হবে কিন্তু খাওয়ার আছে কিনা তা দেখে কাজ নেই। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এই মন্ত্রবলে চলে ব্যাপারটা যা হয়েছে তা ত দেখাই যাচ্ছে। শত শত জন্মলাভ করছে আবার পরমুহূর্ত্তে শত শত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। রোগ, শোক দুর্গতি আমাদের চিরসহচর হ'য়ে ব'সেছে। জাতির শারীরিক শক্তি এতে ক'রে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হচ্ছে। বিশেষতঃ নারীজাতি আমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর বেদনায় দিন গুজরান করছে। এখন অবস্থাটা কোন্ দিকে দ্রুত চলেছে তা বুঝা হ'ল। অনাহার অর্দ্ধাহারে যে জাতির অধিকাংশই দিনরাত কাটাচ্ছে সে জাতিকে কি দরিদ্র বলতে হবে না? আর এইরূপে

যদি চলতে থাকে তাহলে কি দরিদ্রতর হতে থাক্‌বে না ? মাটি যোগাবে কম আর লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং বিদেশে পাঠাতেই হবে। এতে কি ক্রমশঃই প্রতি মানুষের অংশ কমে যাবে না ?

দ্বিতীয়তঃ ধরা আবশ্যক গবাদি কৃষিউপযোগী পশুর কথা। গরুই হচ্ছে আমাদের চাষের একমাত্র বাহন। গরু না হ'লে চাষ বন্ধ থাক্‌বে। এই গরু দিন দিন ধ্বংশের পথে উঠ্‌ছে। বৎসর বৎসর তিন চার লক্ষ গরু, অধিকাংশই গাভী, বিদেশে রপ্তানি হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ সকল গাভীর দুধ জমিয়ে টিনের বাক্‌সে ক'রে বিদেশীরা আমাদের দেশে পাঠায় আর আমাদের শহরের চাকুরীজীবিরা ঐ জমান দুধ তরল ক'রে সদ্যজাত শিশুর প্রাণ রক্ষা করেন। জীয়ন্ত গাভীর দুধ তাদের জোটে না বা সংগ্রহ করতে তাঁরা শ্রম সাপেক্ষ মনে করেন। এই জমান দুধ খাওয়ানর অন্য আরও কারণ আছে সেটা না বলাই ভাল।

জাতির সর্ব্বনাশ এতে সূচিত হবে না ত কিসে হবে ? আমরা স্থানে স্থানে গোহত্যানিবারণী সভা করতে বহু প্রয়াস পাই কিন্তু কোন দিন এই নির্দ্দয় শোষণ প্রক্রিয়াকে একটীবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রেও দেখাতে চাই না। ক্রোধ বা হিংসাজাত রিজল্যুশনের (সভার প্রস্তাব) তর্জ্জন গর্জ্জনে ধর্ম্মের সংস্কারকে উৎপাটিত করা যায় না। শারীরিক অভাবই এই সংস্কারকে শিথিল করবে ও করতে আরম্ভ করেছে। আজ কাল এ কথা বল্‌তে গেলে বিপদে পড়তে হয় কিন্তু এ কথা বলবার আবশ্যকতা আছে।

গোহত্যা চাষার (মুসলমান) দুনিয়া হতে উঠে যাচ্ছে। এ সভার জন্য নয়। নিদারুণ ইকনমিক ধর্ম্ম তাকে পালন করতে হচ্ছে ব'লে তার 'কেতাবের ধর্ম্ম, ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ ক'রছে। এ কথা অস্বীকার ক'রলে চল্‌বে না দু দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে সংখ্যায়

গোহত্যা হ'ত আজ সেখানে একেবারে উঠে গেছে না হয় নাম মাত্র হচ্ছে। কিসে এটা হ'ল? তার গো-হত্যারূপ ধর্ম্ম-বিলাসিতাকে উপভোগ করবার অবস্থা আর নেই। তার ধর্ম্ম-তেজ নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেছে। কালক্রমে এইটাই অভ্যাস গত হ'য়ে দাঁড়াবে ও শিক্ষার প্রভাবে কৃষি-কার্য্যে গোজাতির স্থান কত আদরের তা সে বুঝ্‌বে—গোহত্যা চাষার ইকনমিক রাজ্যে আর দেখা যাবে না। প্রাণের ধর্ম্মের সঙ্গে এই বিলোপ বিরোধী ব'লে মনে হবে না। এ ত গেল পল্লীর অবস্থা। শহরের ব্যবস্থা কি হবে? হিন্দু মুসলমান ত উভয়ের বিরোধকে মিটিয়ে নিলে। অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নূতন ক'রে ক'রতে হবে। আমার কথা শেষ হয় নি।

গোহত্যায় গো-সংখ্যা কমে যেতে পারে কিন্তু গোজাতির শারীরিক অধঃপতনের কারণ কি? সে জন্যও কি গোহত্যাকারী দায়ী? পল্লী মাঠে ধর্ম্মের জন্য বৃষের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে প্রথা উঠে গেছে। এখানেও ইকনমিক ধর্ম্ম এসে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেতাবের ধর্ম্ম বা সংস্কারগত ধর্ম্মকে হিন্দু মুসলমান উভয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়ে ইকনমিক ধর্ম্মকে মাথায় ক'রে তুলেছে। কারণ শারীরিক অভাবই অন্তরের অভাবকে ডিঙ্গিয়ে যায় শতকরা ৯৫ জনের জীবনে। কাজেই সেটাকে একটা অপরিহার্য্য পরিতাপের বিষয় ব'লে মান্‌তে হবেই। এই শারীরিক অভাবের কঠোরতা যেখানে মাথা উঁচু করেছে সেখানে অন্তরের ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। এটা সাধারণ জীবনে নিত্যই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই শারীরিক অভাবকে নিবারণ করবার সহজ উপায় না হ'লে মানুষ অনন্তের পথ ধরতে পারবে না,—অশান্ত কোলাহলে বিক্ষুব্ধ তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ ফট্‌ ক'রেই জীবন মাঙ্গ করবে।

তাই বল্‌ছিলাম বিদেশে গাভীর রপ্তানি ও গোজাতির অধঃপতন এই

ক'রছে। প্রতি বৎসর লাখ লাখ গাভী দেশ ছেড়ে যায়—অবশিষ্ট নির্জীব গাভী ও অপেক্ষাকৃত কৃশ থর্ব্ব বৃষ হ'তে যে গরুর জন্ম হয় তার দ্বারা চাষাকে চাষ করতে হয়। গাভীকে লাঙ্গলে কাঁধ বাঁধাতে হয়েছে আবার অপরিণত বয়স্ক গো শিশুকেও লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে—এতে ক'রে গোজাতির অধঃপতন হবে না কেন ?

এবার বল্‌ব লজ্জা নিবারণের কথা। কলের জন্মের পূর্ব্বে আমাদের কোটী কোটী ভারতবাসী নিজ হাতে আচ্ছাদন তৈরী করত, বিদেশে পাঠাত, সুখে জমির দানকে ভোগ কর্‌ত। গাভীর সদ্য দুগ্ধ, পুকুরের টাট্‌কা মাছ আর ক্ষেতের ধান এখন স্বপ্ন হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু এক সময় ছিল, যখন এই জিনিষটা সাধারণের নিত্য জীবনের শান্তি জুটিয়ে দিত। আজ আমরা হাত চালান বন্ধ ক'রেছি। কলের উপর ভরসা ক'রেই আছি। কল যখন যা খুসী তাই ক'রে আমাদের খাটিয়ে নিচ্ছে। আমরা কলের সেবা করতে কুণ্ঠিত নাই। আমাদের আচ্ছাদন কলের দেশ থেকে আস্‌ছে—আমরা মাটির দানকে দিয়ে সেটা নিয়ে গতর ঢেকে রাখ্‌ছি। তাই কেহ কেহ বলেন, "আমাদের দেশের লোক আগের চেয়ে সহজেই কলের কাপড়ে গা ঢাক্‌তে পারছে। কলের কাপড় এখন যে পরিমাণে আমাদের কোটী কোটী চাষাকে ঢাক্‌তে পারছে কলের পূর্ব্বে তার অর্দ্ধেকও ঢাকা পড়ত না। তিন শ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চাষা এত মূল্যে শস্য বিক্রী করতে পারত না। আর এত বেশী করে গা ঢাক্‌তেও পারত না। কল এসে তাকে বাঁচিয়েছে।" এই অভিমতটীকে খণ্ডন করবার সময় এসেছে।

কলভক্ত বেজায় যাঁরা তাঁরা এটা মেনেই নেবেন ; কিন্তু আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কেন শক্ত তাই বল্‌তে চাই। আমাদের দেশের চাষারা পূর্ব্বের মত গা ঢাক্‌তে পারছে কি

না সে যাঁরা শীতের সময় পল্লীর পাড়ায় ঘুরেছেন তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। চাষারা যুদ্ধের সময় উচ্চমূল্যে শস্য বেচেছিল কিন্তু তার অধিকাংশই বড় বড় বাঁধা অংশীদার লুটে নিয়েছিল উচ্চমূল্যের যথার্থ লাভ ব্যবসায়ীর পকেটে গেছে। জমিদার মহাজন তার বাড়তি বেশীকরে আদায় ক'রেছে। সকলই জানেন শস্যের মূল্য মহার্ঘ হলে জমিদার খাজানার হার বৃদ্ধি করেন। কাজেই চাষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিল। উচ্চ মূল্যের সুযোগ সে ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু পশ্চাতরে কিনতে হয়েছে চারগুণ পাঁচগুণ মূল্যে। ধূর্ত্ত গৃধ্নু ব্যবসায়ী ত কড়া ক্রান্তিও ছাড়েনি। চাষা একগুণ পেয়েছে তদশগুণ তাকে দিতে হয়েছে। অতএব শস্যের উচ্চ মূল্য বাজারে হয়েছিল ব'লে যে চাষা পেয়েছিল একথা বলা নেহাৎ ভুল। চাষা অজ্ঞ মূর্খ, সে সুযোগ বুঝতে পারে না। শীতের সময় কাঠের আগুণে চাষার পরিবারকে সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি কাটাতে হয়েছে ও হচ্ছে। পুত্র কন্যা পরিবার একখানার বেশী কাপড় পরতে পায় না। শস্যের উপরই তার সব নির্ভর করে। কি ক'রে সে বেশী করে গা ঢাকবে? নিতান্ত আবশ্যকীয় পরিধেয়ই সে সংগ্রহ করতে পারে না। কল এসে তাকে পঙ্গু করেছে। সে নিজে কাপড় তৈরি করবার পথ ভুলে গেছে। কাজেই তাকে কলের উপর নির্ভর করতে হয়। আর চাষার এই নিরুপায়কে ব্যবসায়ী যতদূর পারছে ব্যবহার ক'রে নিজের লাভের পিপাসাকে চরিতার্থ করছে। এই নিরুপায়কে বিনাশ করতে হবে। চাষার ঘরে কাপড় তৈরীর কৌশলকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এস্থলে ঘরে ব'সে কাপড় তৈরী করলে যথেষ্ট হবে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কলকে একেবারে বর্জ্জন ক'রে হাতের শিল্পকে প্রাধান্য দিলে আমাদের আচ্ছাদন ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে কিনা এই কথাটার মীমাংসার জন্য অনেকেই ব্যস্ত। এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে আমিও দু একটা কথার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

কল ও চরকা

কল আমাদের মুষ্টিমেয় বাবু শ্রেণীকে ফাইন সাজে সাজিয়েছে বটে, কিন্তু কোটী কোটী নর নারী কোন গতিকে লজ্জা নিবারণ করছে। কল তাদের আচ্ছাদনকৃচ্ছ্রতাকে নিবারণ করতে সমর্থ হয় নি। তার কারণ অনেক। বর্ত্তমানে আমাদের কাপড় আস্‌ছে তিন দিক হতে যথা—সাগরপারের কল, দেশের কল ও হাতের তাঁত। কল এসেও হাতের তাঁত মেরে ফেলতে পারেনি। তাঁতের আবশ্যকতা আছে। তাঁত আমাদের ধাতের জিনিষ। একে তুলে দেওয়ার চেষ্টা আত্মঘাতী হবে। তাঁত আমাদের চাষার 'কাজের কাপড়' গামছা তৈরি করছে। বহুমূল্য সূক্ষ্ম শিল্পও তাঁতে হচ্ছে। কল এসে চরকাকে মেরে ফেলেছে। সূতা আমরা তৈরি করতে পারছি না। সাগরপারের কল কাপড় পাঠাচ্ছে আর দশ বিশগুণ লাভ ক'রে চাষার শ্রমফলকে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কল সূক্ষ্ম হাল্‌কা জিনিষ পাঠাবে, আমাদের ভারী জিনিষ দিয়ে তা কিনতে হবে। আমাদের খরচ বেশী। ক্ষতি আমাদেরই। তা ছাড়া আমাদের দেশের লোক হয় চাকরী করবে না হয় জমি চষবে, আর ওপারে কলে উৎপাদন করবে।

এখন এই উভয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ইকনমিক সূত্র প্রযুক্ত হতে পারে না। উভয়ই যদি যন্ত্রশিল্প অবলম্বন ক'রে দুইটী বিভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি করত তাহলে উভয় দেশের অবস্থা বিশেষত দ্রব্যদ্বয়ের আদান প্রদানে উভয় দেশই লাভবান হ'ত; কিন্তু একদেশের লোক উৎপন্ন করবে আর একদেশের লোক নিরিবিলি সেটাকে ক্রয় করবে কাঁচা দ্রব্যের বিনিময়ে, সেটা শেষোক্ত দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কাজের বিনিময় কাজ হলে একে অপরের দ্বারা সাহায্য ও লাভ পেতে পারে। কিন্তু কাজের বিনিময়ে অকাজ; সেখানে

লাভ হওয়া ত দূরের কথা, একে অপরকে শুধু শোষণ করতে থাকে। এ অবস্থায় আমাদের দেহের আবরণের জন্য সাগরপারে কল বসিয়ে যদি আমরা হা করে ব'সেই থাকি তা হলে এমন সময় আসবে যখন আমরা লজ্জা নিবারণ করতে পারব না। এছাড়া যদি কোন কারণে কল বন্ধ হয়ে যায় তা হ'লেত সর্ব্বনাশ! সুতরাং যে করে হোক্ আমাদের দেশের মধ্যে কাপড় তৈরির ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তা না হ'লে চাষার রক্ত শুকিয়ে যাবে; সে ম'রবে; সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকলই ঠক্ ঠক্ ক'রে থ'সে মাটির উপর ব'সে প'ড়বে। এ অবাক্ করবার কল্পনা নয়। কাপড় তৈরি দেশের মধ্যেই হওয়া চাই, এটা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। তবে তৈরি করতে হবে কলে না হাতে? কলে যদি করা যায় তাহলে পশ্চিমের ধনে ও শ্রমে যে তুমুল দ্বন্দ্ব সমাজের ভিত্তি ভূমিসাৎ করতে বসেছে সেই ধন ও শ্রমের অভিনয়-লোমহর্ষণ কাণ্ড-ক'রে শত ছিন্ন ভারতকে দীর্ণ বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে। শ্রমীর দল বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ী পকেট পূর্ণ করে ধনের স্পর্দ্ধায় শ্রমীকে অবজ্ঞা ক'রতে থাকবে। এই উৎপন্নের অসমান বণ্টনের অবিচার পুঞ্জীভূত হয়ে সমাজের প্রতি শিরা, প্রতি রক্তবিন্দুকে বিদ্রোহী ক'রে তুলবে। এ অশান্তির দুঃখ এখনই ভারতকে প্রপীড়িত করতে শুরু করেছে। পল্লী শূন্য হ'য়ে শহর ভ'রে যাবে। কলের আওতায় শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রমী হ'য়ে নানা নির্য্যাতনের হাতে পড়ে জীবন্মৃত হ'য়ে পড়বে। শহরের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শত শত শ্রমীর একত্র অবস্থান কি ভয়াবহ তাহা কলিকাতার মেছুয়া-বাজার ও টিটাগড়ের মিলক্ষেত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এতে নৈতিক পদ্ধতিকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করতে তারা বাধ্য হয়। পাটের কলের শ্রমীদের বাসের আড্ডায় গেলে বুঝা যায়

শতাব্দীর প্রাক্‌কাল হ'তে শ্রমীর অভিযোগকে মিটিয়ে দিতে কত না প্রয়াস চলছে কিন্তু শ্রমীর অভিযোগ ক্রমশঃ উচ্চৈঃরবে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রমীর দুঃখ বেড়েই চলেছে। তার নিবৃত্তি হয়নি ও হওয়ার আশাও করা যায় না; যদি গতানুগতিক ভাবকে পরিত্যাগ ক'রে কলকে সরল না করা হয়। সুতরাং পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে কলের আখ্‌ড়া ক'রলে চাষার যেমন আজ অবস্থা তাতে, সে ভুঁই ছেড়ে কলে ঢুক্‌বে, জমি 'আল্লা আল্লা' করবে; তারপর আস্ত ইউরোপ এসে ভারতে ঢুক্‌বে, তখন লেগে যাবে একেবারে যুদ্ধ।

আর এক দিক হতে ব্যাপার আরও শোচনীয় হয়ে উঠ্‌বে। ইউরোপে কল শিল্পরাজ্যে বিপ্লব এনেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরাজ্যেও সমভাবে পরিবর্ত্তন সাধন করেছিল। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কল আসবে শিল্প জাগাতে কিন্তু কৃষি চির-অবহেলার সামগ্রী হ'য়ে উপবাস করবে। এর পরিণাম হবে ভয়ানক। আমেরিকার পূর্ব্বভাগ শিল্পের জন্য বিখ্যাত কিন্তু পশ্চিমভাগের যোল আনাই কৃষির জন্য বাঁধা রয়েছে। উভয় স্থলে কল লেগেছে। কৃষি শিল্পের ইন্ধন যোগাচ্ছে। উভয়ই স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রেছে। বড় বড় ধনী কৃষির উন্নতি কল্লে সময়, অর্থ ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যয় করেছে। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হবে না। শিল্পের ইন্ধন বিদেশ হ'তে আন্‌তে হবে। আবার যে ঋণী—সেই ঋণীই হতে হবে। আমাদের কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সময় সময় কৃষির জন্য পল্লীমাঠে বহুসংখ্যক কৃষি শ্রমীর আবশ্যক হয়। বর্ত্তমানে কৃষিশ্রম মহার্ঘ ও দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে একথা সকলই জান্‌তে পেরেছে। তাহ'লে কলে যখন দেশ ছেয়ে যাবে তখন বাঁধা বেতনের জন্য জমির শীতাতপের হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার লোভে সকলে কলের ছাউনিতে যেয়ে হাত

লাগিয়ে দেবে। কৃষিশ্রম আরও দুর্লভ হ'য়ে উঠ্‌বে। অধিক মূল্য দিয়ে চাষ কার্য্য নির্ব্বাহ করা তখন বিষম ক্ষতিকর ঠেক্‌বে; অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে কল ধ'রবে।

আমি বলেছি কৃষির যদি উন্নতি না হয় তা'হলে এই কলের লোভ দিন দিন বেড়ে যাবে। কিন্তু ধরা গেল কৃষি উন্নত প্রক্রিয়ার সাহায্যে বেশ স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রল। তখনও কলের লোভ কম্‌বে না। কলের মধ্যে দুরবস্থা ঘট্‌বে এবং তারই মধ্য হতে যে দুর্ব্বল কৃশ বালক বালিকার জন্ম হবে তারা কর্ম্মী হবে কম। কলের মালিক তাদিগকে বিদায় দিয়ে অতিশ্রমী কৃশ সন্তানকে কলে নিযুক্ত করবে। রুগ্ন, ক্ষীণ, খর্ব্ব সন্তান পথের ভিখারী হ'য়ে শহরের আকাশ বাতাসকে করুণ ক্রন্দনে উতলা ক'রে ফিরবে। কৃষি অনাদৃত হয়েই থাক্‌বে।

বর্ত্তমানের এহেন অবস্থায় চরকা ও তাঁত আমাদের দুঃখ নিবারণ করতে পারবে অনেকটা। চাষারা বৎসরের সকল সময়েই জমির উপর ব'সে থাকে না। তাদের অনেক অবসর আছে।এই অবসর সময় তারা চরকা ও তাঁতের সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই চরকা ও তাঁত অতি সামান্য ব্যয়ে গৃহে খাড়া করা যেতে পারে কিন্তু একটা কলে লক্ষ লক্ষ টাকার আবশ্যক। আমাদের দরিদ্র দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে না। কল বসাতে গেলেই বিদেশী ধনী এসে টাকা খাটাবে। চা বাগানের মালিক অনেকেই বিদেশী। বোম্বাই এর সূতা ও কাপড়ের মিল বিদেশীর হাতে। এদেশে পাটের কল বিদেশীর। বিদেশী মালিক হয়ে আমাদিগকে ক্রীতদাস ক'রে তুলবে আর আমাদেরই পরিশ্রমের ফল বিদেশীর গোলা ভরতি করবে।

এঅবস্থা কি সুখের হবে? আজ চাষা বৎসরের অনেক সময় কাজ

ced idleness) তাকে পেয়ে বসে। আমাদের চাষার স্ত্রীকন্যা চাষার কর্ম্মক্ষেত্রের নিত্য সহচরী পাঁচ বৎসরের ছেলেটিকেও সে বসিয়ে রাখ্‌তে পারে না। তাকে তার পিতার সাহায্যের জন্য মাঠে বেরুতে হয়। বিদ্যাশিক্ষারও সময় তার জোটে না। অর্থের অভাব ত আছেই। সময়ের অভাব আছে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালককে মাঠের কাজে পিতার সঙ্গী হ'তে হচ্ছে। স্ত্রীকন্যাকে ত গৃহের সব কিছুই করতে হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে চাষার পরিবারের কেউব'সে নেই। এটা ঘটে বিশেষ ক'রে যখন চাষের কাজ খুব বেগে শুরু হয়। আবার মাঠের কাজ ফুরিয়ে গেলে এদের সকলই একরূপ অবসর পায়। এই অবসর সময়ে চাষা কোন কাজই পায় না। এই অবসর সময় যদি স্ত্রীকন্যা পুত্র ও বৃদ্ধ মাতা ও আত্মীয়ার প্রত্যেকে শক্তি অনুযায়ী চরকা ও তাঁতে কাজ করতে পারে—বৎসরের প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ অনায়াসে গুছিয়ে তুল্‌তে পারে এবং এই পরিচ্ছদের জন্য আবশ্যকীয় তুলা ক্ষেতে তৈরী করতে পারে। তাহ'লে ঘরের কাঁচা ফসল ব্যবসায়ীর হাতে নিরুপায় হ'য়ে আর তুলে দিতে হয় না। আর শত শত বিঘায় পাট জন্মাতে ও তাহ'তে অর্থ ক'রতে চাষার জীবনশক্তি বৎসর বৎসর যে পরিমাণ কম্‌ছে—পাট তুলে দিয়ে তুলার পত্তন করলে সে শক্তিটা অপচয় হ'তে পারে না। অবশ্য টাকার জন্য পাট অত অধিক পরিমাণে করবার আবশ্যক কি? ঘর ছয়ার প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় সামান্য কিছু করা যেতে পারে। ইহাতে বৎসর বৎসর নদী বিল খাল খানা ডোবা পুষ্করিণী যেরূপে পুতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর হয় তাহাও নিবারিত হ'তে পারে। পাট ধোয়ার মৌসুমে চাষাকে যে নানাব্যাধির হাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সেটাও কমে। তাই বলি চরকা ও তাঁত প্রবর্ত্তিত

সময়ে কাজ দেওয়া হবে—অল্পব্যয়ে প্রত্যেকেই শান্তির সঙ্গে চরকা ও ও তাঁত ঘরে ঘরে খাড়া করতে পারবে—আর কলি যুগের যে অনবচ্ছেদ ছবি—অবিরাম স্রোতের মত ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি—ধীরে ধীরে মুছে যাবে—ভিক্ষুকেরা অনেকেই চরকায় কাজ করতে পারবে। আজ লাখ লাখ ভিক্ষুকের শত করা ৯০ জন কার্য্যক্ষম দেখতে পাবেন। অন্ততঃ তারা চরকার সহজ কাজ অনায়াসে পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় ব'সে করতে সমর্থ হবে। আর আমাদের এত কোটি নরনারী বালক বালিকা সকলই যদি চরকায় লেগে যায় তবে কত সূতা ও কত কাপড় তৈরী হ'তে পারে। কে বলে যে, চরকা ও তাঁত আমাদের দেশকে নগ্নতা হ'তে মুক্তি দিতে পারবে না? যে সময় গেছে তখন কি ভারতের লোক সংখ্যা এতই কম ছিল এবং ভারত কি তখন উলঙ্গ হয়ে' থাকত? একথা জোর ক'রে বল্‌তে পারা যায় কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করা যায় না। চরকা ও তাঁত পরিচ্ছদ প্রশ্নকে পূর্ণ সুচারুরূপে সমাধান করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে গেছে। এই চরকা ও তাঁত কলের মত গৃহ পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করবে না—গৃহের শান্তিকে নিবিড় ক'রে তুল্‌বে—সহৃদয়তা মধুর হয়ে জমে উঠবে; চরকার গানে পল্লীর লতাপাতা ও বনস্পতিশাখা ভ'রে গিয়ে প্রকৃতির সুরভিকে আরও গভীর মনোরম ক'রে তুলবে। মাঠের মুক্ত বক্ষে কাজ ক'রে চাষা গৃহে ফিরে চরকার গানে বিশ্রাম লাভ করবে। কল হ'তে ফিরে শ্রমীকে আঁধার নিরানন্দ কুটীরে রাত্রি প্রভাত করতে হয়—ভাল ক'রে নিঃশ্বাস ফেলবার মত একটুকু খোলা স্থান তার অদৃষ্টে জোটে না। নিরন্তর ব্যস্ততা ও অবিশ্রান্ত কোলাহলে তার জীবনের সকল প্রফুল্লতা ডুবে যায়। এ দৃশ্য আমাদের ভারতের মুক্ত পল্লীতে নূতন ক'রে পত্তন করতে প্রাণ ডরিয়ে উঠে। কলের শ্রমী আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতা জীবনের তরে চুকিয়ে দিয়ে কলে ঢোকে। জীবন

বায়ু বেরিয়ে গেলে শৃগাল কুকুরের মত তাকে আকাশ বাতাস ও কীট পতঙ্গের খাদ্য হ'তে হয়, এক বিন্দু অশ্রু ফেলবার কেউ থাকে না। রোগ যন্ত্রণায় একটা শান্তি সান্ত্বনার কথাও কেউ তাকে শোনায় না। এমনতর শ্রমীর জীবনে আর এ দেশকে ক্লান্ত ক'রে তুলতে দিতে চাই না। আমাদের চাষা খেতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু গৃহ পরিবারে সে এখনও বাঁধা আছে। পেটের দায়ে হাহাকার চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছে না। এই স্থির গম্ভীর পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করতে চাই না। এর মধ্যে অভাব এসেছে বটে, কিন্তু অভাবকে দূর ক'রে একটু সম্পদ আনতে পারলে পল্লী সুখ শান্তির কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে সন্দেহ নাই। কল এসে এটাকে একেবারে বিনাশ করবে। একবার বিনষ্ট হলে আর ওটা ফিরে আসবে না। ইউরোপ হাড়ে মর্ম্মে তা বুঝতে পারছে। যে শ্রমী একবার ঘর ছেড়ে মালিকের হ'য়ে খাটতে শুরু করেছে সে আর ঘরে ফিরতে পারবে না। পশ্চিম কত সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ঝেড়ে কেটে লিখছে, মন্থন করছে কিন্তু যা একবার হারিয়ে গেছে সে শান্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র আর গড়ে উঠল না। এ বড় কম দুঃখের কথা নয়। এই অভিজ্ঞতা হ'তে আমাদের শিক্ষা ক'রবার আছে। সে জন্য এতখানি ঘুরে বলি তাঁত ও চরকাই আমাদের মুক্তির পথ খুলবে—শান্তি আনবে—স্বাধীনতাকে মূর্ত্তিমান ক'রে তুলবে। একে উপেক্ষা করলে চলবে না। যারা ফাইনের ভক্ত তাদেরও নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। তুলা ও রেশম আমাদের দেশে যে সমস্ত মাল তৈরী করবে তাতে কম বাবুগিরি হবে না! বিদেশকে আমাদের এণ্ড মুগা মটকা বিমলিন করবে; আমাদের দুর্ভাগা দেশকে আবার জয়যুক্ত করবে।

কৃষি বিপ্লবের সূচনা

ইউরোপ কলের উপর কল চড়াইতে যাইয়া কলের মধ্যে জড়াইয়া গিয়া গোঙাইতেছে। কল বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে—উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হাতের কাজ একেবারে তুলিয়া দিয়া মানুষকে অবসর প্রদান করিয়া তাহাকে 'শান্তং শিবং সুন্দরং' অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবে—কিন্তু আমরা যাহা দেখিতেছি তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, আর মানুষের সুখের কাজ নাই, মানুষ বাঁচিয়া থাকুক। কলের আওতায় কোটী কোটী নরনারী পড়িয়া খোদার দেওয়া নির্ম্মল মুক্ত বায়ু ও খোলা আসমান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কলের সাহায্যে তাহারা ধ্বংশমুখে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই যে মানুষের ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে তাহার জন্য কে দায়ী? খোদা দুনিয়ায় তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন কি শুধু কলের মধ্যে খাটিয়া খাটিয়া জীবন সমাপ্ত করিতে? এখন উপায় কি?

উপায়ের উদ্ভাবন করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ কলের বিপরীত অবস্থাটা দেখাইতে ইচ্ছা করি। কলের বিপরীত অর্থ কলহীনতার বিফলতা। কলের উপর কল বর্দ্ধিত হইয়া ইনডাষ্ট্রীয়ালিজমের চরম আধিপত্যের থাপ্পা যোগাইয়াছে। ইউরোপে আজ কলহীন কৃষিকার্য্যের চরম অসহায়তা ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে, এই বলহীন কৃষক ও কলহীন কৃষি-কার্য্যকে আমি ইনডাষ্ট্রীয়ালিজমের বিপরীত অবস্থা বলিতে চাহিতেছি।

মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায় ইনডাষ্ট্রীয়ালিজমের যুগে যেমন এক-দিকে অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা যুবক যুবতী অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া কল চালাইয়া শুধু প্রস্তুতই করিতেছে কিন্তু উপভোগ করিতেছে না—

উপভোগ করিতেছে সমাজের সামান্য কতকগুলি ব্যক্তি ; তেমনি অন্য দিকে কলের লোকের যাহা আবশ্যক তাহা ঐ হতভাগা বলহীন কৃষকই যোগাইতেছে। কল কেবল মানুষের বিলাস দ্রব্যের আয়োজনে অধিকাংশ সময় নিয়োজিত। ইহাতে লোকের বাবুগিরি, নবাবী চাল সাহেবিয়ানা ইত্যাদি অনাবশ্যক সুখ ও 'ইন্দ্রিয় সাধনার' মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। পেটে ক্ষুধা থাকে থাকুক—বাহিরের 'ঢং'টার কোন ক্রমেই কম্‌তি না ঘটে, এই হইয়াছে বর্ত্তমান সভ্যতার আদি মন্ত্র। ইউরোপের অধিকাংশ লোক ঐ ঢংএর মসলা তৈরী করিয়া বড় বড় লর্ড বেরণ প্রভৃতির গৃহে মৌজুদক রিতেছে। তাহা দেখিয়া ভারতবর্ষের লোক ধানচাল দিয়া তাহা আয়ত্ত করিতেছে। এদিকে ধান ফুরাইতেছে, গ্রামের গোলা শূন্য হইতেছে! দেশের লোক আত্মরক্ষার্থে ছুটিয়া ঋণে জড়াইতেছে। আজ দেশের কৃষক শুধু দুটী অন্ন জোগাইতে পারিতেছে না। যদিও কষ্টে সৃষ্টে জুটায়, তাহা শুধু শুধু খাইয়াই প্রাণটা ধরিয়া রাখিতেছে। এই ত গেল ইউরোপের ইনডাষ্ট্রিয়ালিজমের প্রবল বন্যার যে স্রোত এদেশে আসিয়া আঘাত করিতেছে তাহার ফল। এই ফলটা ভারতের কৃষকের উপর কিরূপ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই এই সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়।

ওদেশে শ্রমীরা তৈরী করিয়া সমস্তই মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণী ও ধনাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায়ের সুখ সম্পদ ও পুষ্টিসাধনকল্পে নিয়োগ করিতেছে। এক কথায় একজনের কল্যাণ—কল্যাণ নয়ত—শরীরের ও ইন্দ্রিয় পরিপুষ্টির—জন্য দশজন মানুষ জীবন ও প্রাণকে ব্যয় করিয়া দিতেছে। এই বাধ্যতা-মূলক আত্মবিক্রয় ও আত্মনিয়োগ সমাজের একশত পরিবারের ৯৯টী পরিবারকে কলের মুখে বলিদান করিতেছে। একটী পরিবার মাত্র

তাহারাই ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে উভয়পক্ষের মঙ্গল অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ইন্‌ডাষ্ট্রীয়ালিজমের ফলে সমাজ কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই শ্রেণীগুলিকে এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আমরা কয়েকটী কথা বিবেচনা করিব। যথা উৎপাদক শ্রেণী ও ভোগী অনুপোদকশ্রেণী। উৎপাদক শ্রেণী সর্ব্বদা অভাবগ্রস্ত তাই তাহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা করিয়া শ্রম না করিলে দু-বেলা অন্নেরই সংস্থান করিতে পারে না; খোদার নাম করা ত দূরের কথা। আর যাহারা উপরে আরামে বসিয়া ভোগ করিতেছে তাহারা ত ভোগের মধ্যে আত্ম-হারা হইয়া পড়িতেছে। তাহাদেরও পরমাত্মার চিন্তা নাই। জীবনের পরিতৃপ্তিকেই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া তাহারা ধরিয়া বসিয়াছে। আবার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা ঐ শ্রমীসম্প্রদায়ের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের পরিশ্রমের লভ্যাংশকে অপহরণ করাই তাহাদের (মধ্য শ্রেণীর) কাজ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমীসম্প্রদায় শ্রমের ফলভোগ করিতে পারে না। তাহার ফল ভোগ করে ঐ মধ্যশ্রেণী ও ধনীশ্রেণী। মধ্যশ্রেণী অর্থ সঞ্চয় করে আর ধনীশ্রেণী উপভোগ করে আসল জিনিষটা! মধ্যশ্রেণীও ভোগ করে কিন্তু অর্থই হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের চরম পরম কাম্য ও লক্ষ্য—সুতরাং প্রকৃত দ্রব্য তাহারা কখনই একান্ত করিয়া উপভোগ করিতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে—নিম্নস্তরে শ্রমীসম্প্রদায় উদরপূর্ত্তির জন্য জীবন ব্যাপিয়া উদ্বিগ্ন; মধ্যস্তরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থের লালসায় দিবস রজনী ঘুরিয়া মরিতেছে; আর উচ্চস্তরে—ধনী সম্প্রদায় বস্তু উপভোগে নিরন্তর রত রহিয়াছে! ইহাতে নিম্নস্তরের শ্রমীসম্প্রদায়ের উপর অবশিষ্ট দুই সম্প্রদায় চাপিয়া বসিয়া আছে। এই

দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অনুৎপাদক (unproductive) * তাহারা কাজ করিয়া কোন বিশেষ দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে না। তাহারা কেবলই দশজনের দ্রব্য অপহরণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, সরবরাহকারক (Middlemen parasites), মাড়ওয়ারি ব্যবসায়দার (Speculators), জমিদার সম্প্রদায় ও নায়েব গোমস্তা সম্প্রদায় প্রভৃতি দেখান যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে পলিটিক্যাল বিষয় একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, গণতন্ত্র (Democracy) যতই বাড়িতেছে, রাজকীয় কার্য্যকলাপ ততই শাখাবহুল হইতেছে—শাখাবহুলতার জন্য লোকের উপর ট্যাক্স বর্দ্ধিত হইয়া চাপিতেছে। ট্যাক্সের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর উপর বেশী চাপে। উদাহরণচ্ছলে বলা যায়—আমাদের জমিদারের উপর ট্যাক্স চড়িলে জমিদারগণ তাঁহাদের নিম্নস্থ তালুকদারদের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে আদায় করেন —তালুকদারগণ আবার তাঁহাদের নিম্নস্থ গাঁতিদারদের উপর চাপ দেন,— এইরূপে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে বৃদ্ধির হারটা চলিতে চলিতে ট্যাক্সটীর সমগ্র ও তাহার উপরও কিঞ্চিদধিক চাপ ঐ জমির উপর যাইয়া পড়ে। ট্যাক্স তখন রাজসরকারে গেল—জমিদারের গৃহে গেল—তালুকদারগণ কিছু গ্রহণ করিল—এই রূপে রাজসরকারের ট্যাক্স উপলক্ষ্য করিয়া প্রজাদের রক্ত শোষণের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভুক্তভোগী হইল ঐ বেচারা চাষা, যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া মাটী ভাঙ্গিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে। এক জন কৃষক উৎপাদন করিতেছে আর দশজন বসিয়া খাইতেছে।

---

* কেননা মানুষের উপকারে আসে এমন দ্রব্য সৃষ্টি করাকে উৎপাদন করা বলা হয়। উপকারক বস্তু তৈয়ার করা উৎপাদন (production)—লেখক।

ইউরোপে শ্রমীদের দশা আর আমাদের চাষাদের দশা একরূপ হইয়াছে। ইউরোপে কলের শ্রমী সকল সমাজের ভার বহন করিতে যাইয়া নিজের জীবনকে বিক্রয় করিয়া বসিয়াছে আর আমাদের ভারতের চাষা বাবু, মহারাজ, বাহাদুর, নায়েব মহাশয়, মহাজন, গাতিদার তালুকদারের পকেট ভরতি করিতে গিয়া নিজের গোলা শূন্য, শরীর আচ্ছাদনহীন ও রুগ্ন এবং বাসন খালি করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৬ কোটী লোক মরে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? না খাইতে পাইয়া, না পরিতে পাইয়া তাহারা রক্তশূন্য দেহকে কতক্ষণ রোগের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে? প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইলে, শরীর শীত-বর্ষা হইতে রক্ষা করিতে পারিলে? শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি থাকিলে বিনা ঔষধে অনেক রোগকে দূরে সরাইয়া রাখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের চাষার অদৃষ্টমার্গে প্রচুর আহার, প্রচুর আচ্ছাদন ও স্ফূর্ত্তি বোধ হয় লেখা ছিল না। পল্লীগ্রামে যাঁহারা আছেন তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন—গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠে কাজ করিতেছে—গৃহে পড়িয়া স্ত্রী, বৃদ্ধ মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি স্ত্রীলোক সংসারের কাজে সর্ব্বদাই ক্লান্ত। বিশ্রাম কাহারও পক্ষে জুটিতেছে না। পল্লীর বৃদ্ধা আর পা ছড়াইয়া বসিয়া উপকথা বলিতেছে না—ছেলেরা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাডুডু কপাটি ও বুড়াচু প্রভৃতি খেলার স্ফূর্ত্তিতে আর চেঁচামেচিতে গ্রাম মাথায় করিতেছে না—সন্ধ্যার আগমনে কাল অন্ধকার প্রকৃতিকে ঢাকিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলকেই যেন আবৃত করিয়া ফেলে। সব তুই নিস্তব্ধ নীরব। অন্যূন দশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা স্মরণ করিলে আমরা সকলেই গ্রামের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিব। আর একটা ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই, পল্লীতে ছেলেদের সংখ্যা বৃদ্ধদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বৃদ্ধরাই যেন সংসার ভরিয়া

চলিয়াছে। বালক বালিকাগণই রোগে ভুগিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সংসার নবীনদের জন্য। কিন্তু পল্লীতে গেলে মনে হয় যেন পল্লী-সংসারে নবীনদের স্থান নাই, প্রাচীনদেরই লইয়া সব। পল্লীতে ঈদ ও পূজার সময় আমোদ আহ্লাদ নাই। কখন পূজা আসে যায়, তাহা কেহ যেন বুঝিতেই পারে না। ছেলেদের আহ্লাদে আটখানা হওয়া আর কেহ দেখিতে পায় না। হিন্দুদের পূজা পার্ব্বণের সময় নূতন নূতন কাপড়ে বালকবালিকা যুবক যুবতীদের অঙ্গ শোভিত হইতে ক্বচিৎ দেখা যায়। ঈদের সময় 'আল্লা' 'আল্লা' রবে চারিদিক আর মুখরিত হয় না। ঈদের আনন্দ একেবারে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ঈদ নীরবে আসিয়া নীরবেই চলিয়া যায়। প্রাণ খুলিয়া ঈদের মিলন উপভোগ আর কেহ করিতে পায় না। ঈদের সময় পল্লী পরিবারে আমরা বহু আত্মীয় স্বজনের সমাগম আর দেখিতে পাই না। পূজাপার্ব্বণ, ঈদ, রোজা ও শবেবারাতের সময় পল্লী পরিবারে এক সময় যে অফুরন্ত আনন্দের কোলাহলে দিক দিগন্ত নিনাদিত হইত; আর গ্রামের ছেলেরা কতদিন যে তাহার আলোচনা করিত—তাহা আর আজ নাই। সে সময় গ্রামের 'আওবাচ্চা' 'বুড়াবুড়ী' 'ছেলেমেয়ে' সমস্ত প্রাণ খুলিয়া দিয়া ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এক অপূর্ব্ব সম্মিলন করিত। সে সম্মিলন কোথায় গেল? সে আনন্দের উপায় আর হইতেছে না। চিরঅভ্যাস-বশতঃ পল্লীবাসী মন্দিরে বা মসজিদে আসিয়া কেবল হাজিরা দিয়া চলিয়া যায়। তাহারা কাজে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ কাজ সারিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে। সমস্তই এখন প্রাণহীন অভ্যস্ত আচারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের বুকে ধানের ক্ষেতে চাষারা গাতায় বসিয়া সপ্তমসুরে আর গান গাইতেছে না। এক সময় ছিল, যখন জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে সমস্ত দিনই প্রায় 'গাতার' গান ও সমস্বরে 'আল্লা' 'আল্লা' রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত ও আকাশ

বাতাস্ আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইত—চাষার সমস্ত ক্লান্তি মাঠের মধ্যেই মিলিয়া যাইত। কিন্তু এখন চাষা সারা দিবসের শ্রান্তি শরীরে বহন করিয়া নিরানন্দ গৃহে ফিরে। তখন অভাবের কথা, দেনার ভাবনায় তাহার মাঠের শ্রান্তি দশগুণ বৃদ্ধি পায়। পল্লীগ্রামের লোকসংখ্যাও খুব কমিয়াছে! অনেকের ভিটা ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন গ্রামের মধ্যে লোক জম জম করিত, প্রত্যেকের গৃহে একখানা বহির্লিজ, খানকা বা বৈঠকখানা থাকিত এবং রাত্রিতে ঐ সমস্ত বৈঠকখানা লোকে ও অতিথিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অনেক সময় এমনও হইত,—ভিন্ন গ্রাম হইতে কেহ আসিলে শুইবার স্থান পাইত না। কিন্তু আজ সমস্ত বৈঠকখানাই শূন্য থাকিতেছে, অনেকের বৈঠকখানার ভিটায় ধান, না হয় তরকারি জন্মিতেছে। তখন এত লোক ছিল, তবু লোকের খাদ্যের অভাব হইত না—সেই সমস্ত জমি আছে, সমস্তই আছে ও লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তবু লোকের অভাব, দারুণ দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। তারা রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইতেছে না এবং অকালে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে। তখন গ্রামের বালক বালিকা যুবক যুবতীদের সংখ্যা দেখিলে বাস্তবিক "নবীনদের জন্য সংসার" তাহা বেশ বুঝা যাইত। কিন্তু এখন সমবয়স্ক যুবকদের দশজন একত্র দেখিতে পাওয়া যায় এমন গ্রাম খুব কমই আছে। পল্লীর এমন দশা দেখিলে মনে হয় যেন পল্লীর অস্তিত্ব আর থাকিবে না। উদ্ভিদেরাই বাঁচিয়া মানুষকে সরাইয়া দিতেছে। ডারুইন এ সময় বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় Survival of the trees and plants এই থিওরি প্রমাণ করিবার জন্য পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। মানুষের ভিটা উজাড় হইতেছে, আর উদ্ভিদ জঙ্গলে তাহা অধিকার করিয়া বসিতেছে। হায়, কেন এমন হইল!

ইন্‌ডাষ্ট্রীয়ালিজমের স্রোত এদিকে বড় বড় শহরের সৃষ্টি করিতেছে।

গগনের সঙ্গে তাহাদের প্রাণের সম্পর্ক একেবারে চুকিয়া গিয়াছে। সকলই একটা না একটা কল কারখানায় না হয় কেরাণীখানায় চাকুরী লইয়া নিযুক্ত আছে। আফিসের জন্য তাহাদের যত ভাবনা। প্রাতে উঠিয়াই 'আফিস। আফিস।' সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিয়াও ক্লান্তি—রাত্রিতে স্বপ্নেও আফিসের কাজ। এই আফিসের মধ্যে শহরের লোক নিজে-দিগকে বিক্রয় করিয়া বসিয়াছে। কলের মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের কথা বলার আবশ্যক নাই।

অতএব দেখিতে পাইতেছি কোথায়ও মানুষ শান্তিতে নাই। ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ইউরোপে 'দাও শান্তি', 'শান্তি কৈ ?' আর চাষার ও চাকুরের ভারতে 'দাও শান্তি' 'শান্তি কৈ ?" রব উঠিয়াছে।

ভারতের চাষার চাষের অবস্থাটা এই প্রসঙ্গে আবার একটু না বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হইবে না। আমরা অনেকেই দশবৎসর পূর্ব্বে পল্লী গ্রামের মধ্যে, মাঠে ও চতুষ্পার্শ্বে অনেক জমি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সে সকল জমিতে গরু, ছাগল, মহিষ চরিত। কিন্তু এখন গ্রামে একটা গরু চরাইবার স্থান নাই। সমস্ত চাষ করিয়া চাষারা ধান করিয়াছে। অনেকে বাড়ীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত চষিয়া ধান পাট করিতেছে। তবুও লোকের অভাব যাইতেছে না। ইহার কারণ কি ? কারণ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অর্থনীতির একটা সূত্রের উল্লেখ করিতে হয়। সূত্রটী এই—মাটি যদি যেমন তেমনি থাকে (অর্থাৎ তাহাতে যদি প্রচুর সার না দেওয়া কিংবা অন্য কোনরূপ উন্নতি না করা হয়) এবং জমির পরিমাণ যদি সমান থাকে এবং শ্রম তাহাতে সমভাবেই প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সেই জমি প্রতি বৎসর কম পরিমাণে ফসল প্রদান করিবে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসর তাহাতে ফসল কম হইবে। উৎপন্ন

আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া চাষারা যেখানে যে জমি পাইতেছে তাহাতে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য প্রাণ পণ করিতেছে। তাহারা জমিতে প্রচুর সার দিতে পারে না। সেই জন্য ফসল কমিয়াছে। ফসল কম হইয়াছে বলিয়া চাষারা প্রচুর খাইতে পাইতেছে না। শরীর তাহাদের দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—ওদিকে আবার গরু চরাইবার জমিগুলি লাঙ্গলের তলে পড়িয়া গেল—গরুগুলি শুকাইতে লাগিল। তাই দেখিতে পাই কৃশ কৃষক, রুগ্ন গরু দ্বারা জমির চাষ করিতেছে। গরু রুগ্ন শীর্ণ হইতেছে বলিয়া জমির এক ঘণ্টার চাষের জন্য চাষা চারি ঘণ্টা লাগাইতেছে। ইহাতে উত্তম গরু ও জন্মিতেছে না। সে জন্য অনেকে বলদ ছাড়িয়া গাভী দ্বারা চাষের কাজ চালাইতেছে। গাভীর দুধ শুকাইয়া যাইতেছে। শিশু দুগ্ধ অভাবে শীর্ণ হইতেছে—কখন কখন অকালে কাল গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে কৃষির দুর্দ্দশা চতুর্দ্দিকে। কৃষির উন্নতি নাই। উত্তম সার নাই—বলবান্ বলদ নাই—ঘাসের জমি নাই—কৃষকের স্বাস্থ্য নাই—দুগ্ধবতী গাভী নাই—জমির শক্তি হ্রাস হইয়াছে। ইহাতে কিরূপে প্রচুর ফসল হইবে? কিরূপেই বা চাষার অবস্থা ফিরিবে? ইহার উপর আবার খাজনা ও আবওয়াবের অত্যাচার! কৃষির উন্নতি নাই কিন্তু জমিদার খাজনা কমায় নাই বরং বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সময় সময় নজরানা উপলক্ষে প্রজার নিকট হইতে কত আদায় করিয়া লইতেছে। কৃষির অবনতি বোধ হয় বৎসর বৎসর দশাংশের একাংশ হিসাবে ঘটিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রকৃতির নিদারুণতা অনেক সময় প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়। বৃষ্টি অভাবে ফসল হইল না—ইহা প্রায় শুনা যায়। কিন্তু ইহাতেও প্রজার নিষ্কৃতি নাই—তাহাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছে—"হাজাশুখা প্রভৃতি কোন কারণে ধার্য্য খাজনার কমি বেশী আমলে আসিবেক না।"

এই অজন্মা হওয়া স্বত্বেও যে প্রজাকে দেনার জন্য জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে হয় ইহার জন্য দায়ী কে? [illegible]

করিয়া নিজেদের রক্তপুষ্টি করে। তাহারা একেবারে অনুৎপাদক সম্প্রদায়। তাহারা প্রজার অর্থ লইয়া নানাপ্রকার অকথ্য বিলাসভোগে শহরের রম্যহর্ম্ম্যে কালযাপন করিতেছে—আর নগ্ন কৃষক অনাহারে ঐ শীতে কাঁপিতেছে ও কাদায় বসিয়া নিড়াইতেছে। এ দৃশ্য আর কতদিন!

কলের বাহাদুরীতে ইউরোপের দুর্দ্দশা দেখিয়াছি। ভারতের নিষ্কর্ম্ম কৃষকের দুরবস্থাও দেখিলাম। ইউরোপের শ্রমী আর ভারতের চাষা; ইহারাই সমাজের ভিত্তি। ইহাদের উপরেই যত বড় বড় লোক বসিয়া আছেন। ইহারাই প্রকৃত উৎপাদক সম্প্রদায়। দশজন শ্রমীর উপর যেমন একজন ধনী ইউরোপে আধিপত্য করিতেছে সেইরূপ দশজন কৃষকের উপর একজন জমিদার স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করিতেছে। দশজন শ্রমী যেমন একজনের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে একেবারে বিক্রীত হইয়া বসিয়া পড়িতেছে সেইরূপ আমাদের দশজন চাষা জমিদারের দ্বারে বিক্রীত হইয়া আছে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় এই শ্রমী সম্প্রদায় ও চাষা সম্প্রদায় বর্ত্তমান যুগের 'দাস সম্প্রদায়' (slaves of to-day)। আবার শুনিতে পাওয়া যায়,জগতের পৃষ্ঠে নাকি (slavery) দাসত্ব আর নাই। শ্রমীদের অবস্থা আর চাষাদের অবস্থা কি দাসত্ব নয়? শ্রমী ধনাঢ্য মূলধনাধিকারীর হাতে বাঁধা। সে শ্রমীকে যাহা বলিতেছে সে তাহাই করিতেছে। আমাদের চাষার উপর যখন যে হুকুম হইতেছে—তখন তাহাকে তাহাই করিতে হইতেছে। যদি না করে তবে পাইক বা পেয়াদার লাঠির আঘাত তাহার পৃষ্ঠে পড়িতেছে। ইহার পরিণাম যাহা তাহা ত ইউরোপে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কেবল ভারতের চাষা এখনও নীরবে অত্যাচারের উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়া চলিয়াছে। যুগ

সঞ্চিত নির্য্যাতনের বেদনা মূকের মত বহন করিতেছে—বুঝিবা কবে তাহার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়!

যতদিন শ্রমী তাহার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পাইবে এবং যতদিন জমিদার কৃষকের জমির উর্ব্বরা শক্তিকে প্রখর করিয়া না তুলিবে—যতদিন চাষা তাহার সমস্ত অধিকার স্বাধীনতা ফিরিয়া না পাইবে—যতদিন জমিদার নিজে উৎপাদক না হইবে—যতদিন তাহার বিলাস ভোগ-তৃষ্ণা বিদূরীত না হইবে—যতদিন কৃষকের উৎপন্ন শস্যকে লইয়া জমিদার বিলাসিতার উপকরণ করিয়া অপচয় করিবে, ততদিন শান্তির আশা আকাশ-কুসুম থাকিয়া যাইবে—ততদিন প্রতি মুহূর্ত্তে বিপ্লবের আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক। ভারতের কৃষকদের মধ্যে যদি কোন দিন বিপ্লব (Bolshevism) উপস্থিত হয়, তজ্জন্য জমিদার সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবে না। তাঁহারাই কৃষক-প্রজাকে তাহার স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব, স্বাধীনতা, হইতে বঞ্চিত করিয়া বিপ্লবের সূচনা করিতেছেন—তাঁহারা কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছেন। আমরা সে জন্য ইউরোপের শ্রমী সম্প্রদায়ের জাগরণে সতত আমাদের কৃষকের জাগরণ (Peasant Revolution) প্রতীক্ষা করি।

IMPERIAL
LIBRARY